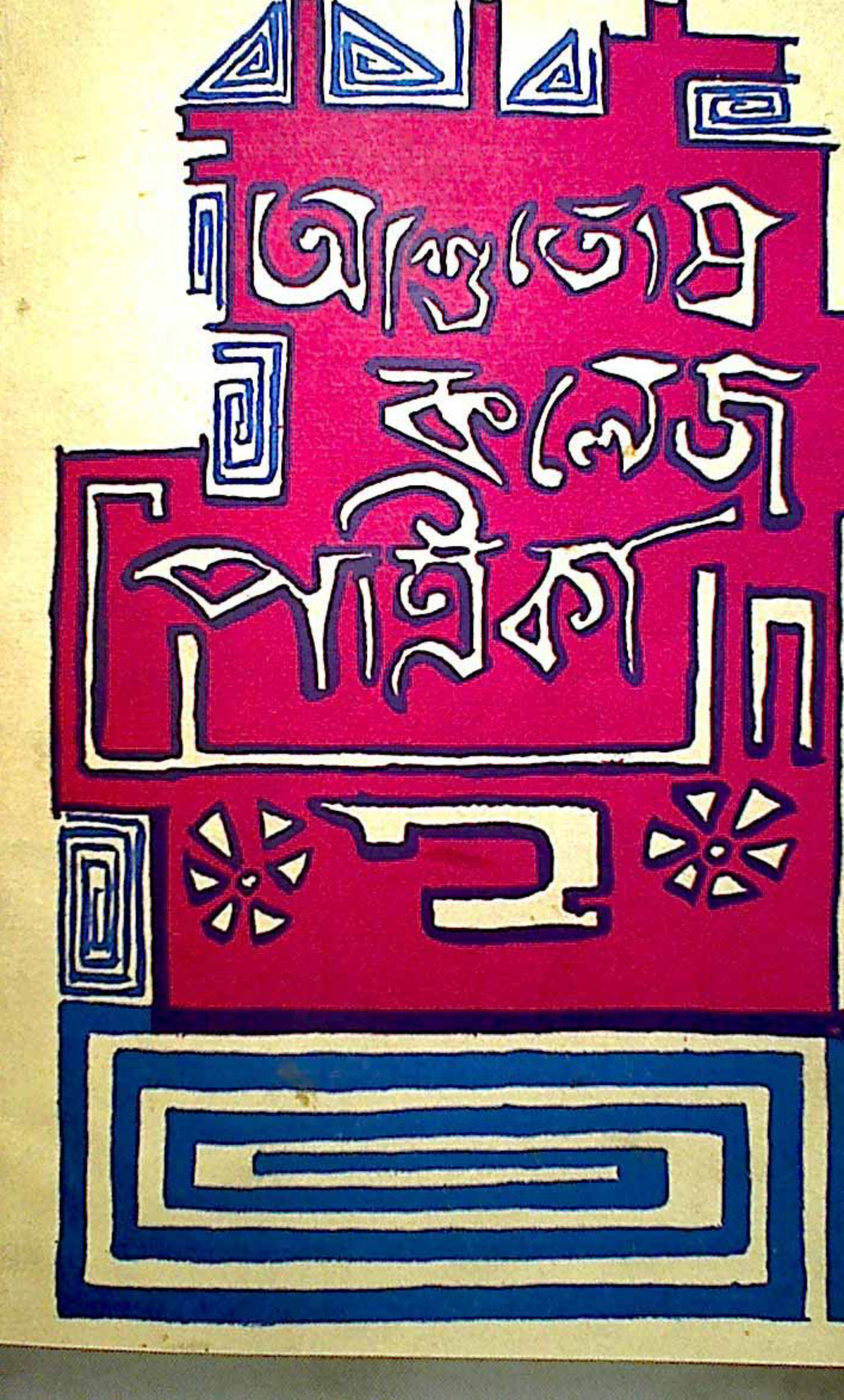
আশুতোষ
কলেজ
পত্রিকা

৪০তম সংখ্যা

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক
শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসত্যব্রত সান্যাল
শ্রীভবেশচন্দ্র সেন

১৩৭২

প্রচ্ছদ : সোমেন ঘোষ ; তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য
নামপত্র : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ; প্রাক্তন ছাত্র

Published by Shri Khagendra N. Sen, Principal, Asutosh College,
92 Shyamaprasad Mookherjee Road, Calcutta 26 and Printed by him at
Navana Printing Works Private Ltd, 47 Ganesh Chunder Avenue, Calcutta

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ... ১

গল্প

নূপুর গুঞ্জরী যাও	শ্রীত্রিদিবকুমার বসু	৩
তারা নয় জোনাকি	শ্রীভগীরথ মিশ্র	১২
শুভা	শ্রীসুমিত্রকুমার রায়	১৭
বর্ণালী অন্ধকার	শ্রীশংকর দাশগুপ্ত	২২
বেহাগ	শ্রীকুণাল চট্টোপাধ্যায়	২৮

কবিতা

তোমার ডাক	শ্রীসুশীলকুমার বশিষ্ট	৩৫
বরষ সন্ধ্যা	শ্রীজয়দেব দাস	৩৬
সম্ভাব্য সাক্ষাতে	শ্রীযোগব্রত চক্রবর্তী	৩৭
আমি	শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
মিনতি	শ্রীরমেন্দ্রনাথ কাঁড়ার	৩৯
ডুবুরী	শ্রীগৌরীশঙ্কর	৪০
স্বচ্ছ দৃষ্টি	শ্রীতারককুমার বসু	৪১

প্রবন্ধ

অমৃতের পুত্র	শ্রীপ্রলয় শূর	৪৪
কবিতা ও কবিসত্তা	শ্রীসোমেন ঘোষ	৪৯
বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-ধর্ম	শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ	৬০
রাজসঙ্গম	শ্রীরঞ্জনকুমার ঘোষ	৬৯
THe CIGAr AbSTAiner	শ্রীভবেশচন্দ্র বসু	৭২
ভারত-ইতিহাসে সমন্বয় সাধনা-মধ্যযুগ	অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন	৭৬
প্রতিবেদন		৮৬
গ্রন্থ-আলোচনা		৯৭

ENGLISH SECTION

A Retrospection	Sri Kunal Chatterjee	101
In Memoriam	Prof. Sri Sailendra Nath Sarkar	102
United Nations Progress Since 1945	Sri Subhas Chandra Sinha	103
SHASTRIJI-Our great departed leader	Sri Bhupal Sundas	107
Glimpses of Thailand	Rev. U. Namawamsa of Thailand	109
The Romance of wireless	Sri Ahibhusan Bose	114
Annual Report 1965		118
Asutosh College—N. C. C.	Lieutenant K. K. Mookherjee	120
List of Editors		123

জনগণমন অধিনায়ক

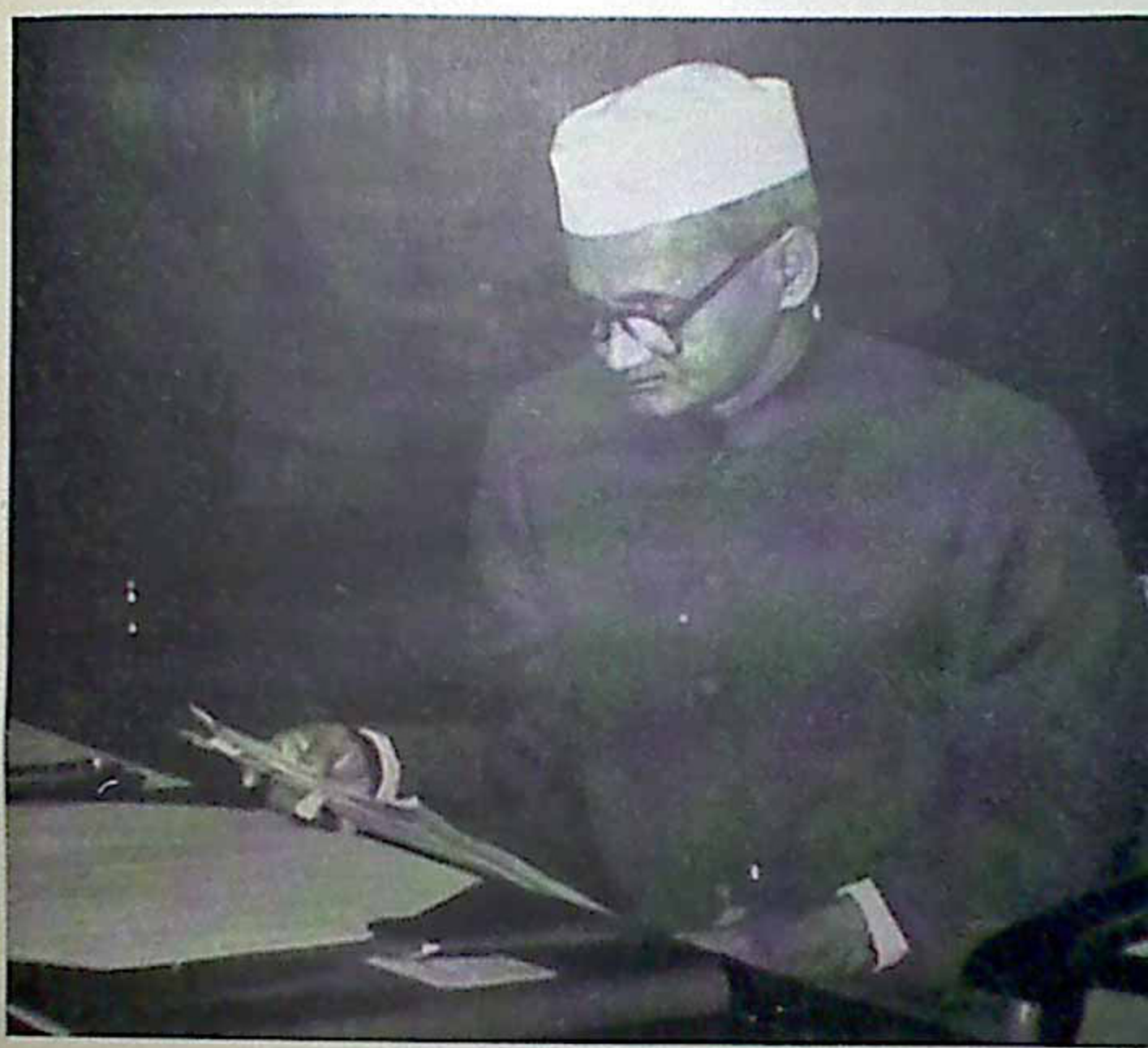

২ অক্টোবর ১৯০৪ — ১১ জানুয়ারী ১৯৩৬

"বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম—"

সম্পাদকীয়

মাত্র ১৯ মাস পূর্বে ১৯৬৪ সালের মে মাসে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সর্বজন ধন্য জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুসংবাদ যেদিন শুনেছিলাম, সেদিন সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পরলোকগত নেতার আদর্শকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে পারবেন এমন একজন কাণ্ডারীর খোঁজে পেয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে। কিন্তু আজ ১৯ মাস পরে আমাদের পুনরায় আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে যে আমাদের প্রিয় লোকবরেণ্য দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা লালবাহাদুরজী আর আমাদের মধ্যে নেই; তিনি অকস্মাৎ পরলোকগমন করেছেন। শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ সম্পাদকীয় লিখতে বসে অন্য কিছুই আমাদের মনে বা কলমে আসছে না। শুধুমাত্র তাঁর পুণ্যজীবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কথাই আমরা ভাবব; শান্তির অতন্দ্র প্রহরী লালবাহাদুরজী শান্তির জন্য যে জীবন দান করেছেন, সেই শান্তির পথই হবে আমাদের একমাত্র আদর্শ।

এই সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে গত সংঘর্ষে নিহত তিনজন বাঙ্গালী যোদ্ধার কথা। তাঁরা হলেন যথাক্রমে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাল রায় ও তপন চৌধুরী। এঁদের মধ্যে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এঁদের জন্য আমরা গর্বিত। এঁদের আত্মার স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আণবিক বিজ্ঞান শাখার পথিকৃৎ ডাঃ ভাবার আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় পরলোকগমনে ভারতীয় তথা বিশ্ববিজ্ঞানের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এছাড়া বিশ্বের অন্যতম কথাসাহিত্যিক সমরসেট মমের মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কলেজের আদিপর্বের অন্যতম অধ্যাপক ছাত্রপ্রিয় কুমুদ রায়চৌধুরী পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। এঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পর সমস্যা-কণ্টকিত ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করেছেন জওহরলাল নেহরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ইনি সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় ও সমগ্র ভারতে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ভারতের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পূর্ব থেকেই শ্রীমতী গান্ধী পরিচিতা এবং আমরা আশা করব তিনি এই সকল সমস্যা সমাধান করে সমগ্র দেশের নিকট তাঁর পিতার মতই জনপ্রিয় হবেন। এঁকে জানাচ্ছি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

সাহিত্য একাদেমী কর্তৃক প্রদত্ত সাহিত্য-পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন প্রখ্যাত বাঙালী কবি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে তাঁর "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত" কাব্য-গ্রন্থের জন্য। এ বছরে

রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্র
জন্য। তাঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

এবার কলেজ পত্রিকার কথায় আসা যাক। আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ের
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আমরা এবারকার পত্রিকাকে প্রকাশিত করার চেষ্টা করে
আমরা যতদূর সম্ভব ছাত্রদের কাছ থেকেই পত্রিকার সব কিছু নিয়েছি। অ
প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে রচনা এমন কি বিভিন্ন ছবি প্রভৃতি তাদেরই দেও
স্থানাভাবের দরুণ সব রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তৎসত্ত্বেও লে
ছাত্র-বন্ধুদের সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি স্কুল কলেজের স্বাভাবিক পঠনপাঠনে
বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তা বোধকরি ইতিহাসে তুলনারহিত। দোষ কোন্ তর
সে বিচারে না বসেও একথা বোধকরি বিনা দ্বিধায় বলা চলে, এ পরিস্থিতি মো
বাঞ্ছনীয় নয়, সুস্থ মানসগঠনের সহায়কও নয়। জল, এ্যাম্বুলেন্স, দমকল প্র
জরুরী সংস্থার মতো স্কুল কলেজকেও রাজনীতি থেকে মুক্ত রেখে সব অবস্থা
চালু রাখা কি একেবারেই অসম্ভব? কোনও পক্ষের কোনও একজন নেতৃস্থা
ব্যক্তিকে তো উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার দিতে শোনা গেল না। বাঙলাদেশের সুস্থমানসিকত
কি অপমৃত্যু ঘটেছে? বাঙলাদেশ কি সমাজসেবী মনীষিবর্জিত দেশে রূপান্তরি
হ'য়ে ভাগাড়ের শকুনের মতো মৃতপ্রায় বঙ্গজননীকে নিয়ে হানাহানিতে মত্ত থাকবে
সমাজবিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা যেমন করি, অন্যায়ের প্রতিকার-ব্যবস্থাও তে
দাবি করি। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা ও মহিমা নিয়ে বাঁ
চাই। সুস্থ, স্বাভাবিক ও নিরুদ্বিগ্ন জীবন পেতে চাই।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী"র শতবার্ষিকী উৎসব আমাদের মহাবিদ্যা
অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অল্প সময়ের ভেতর পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গে
তবুও আশা করা যায় যে অন্যান্যবারের মত এইবারেও পত্রিকার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাক
পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের লাইব্রেরীয়ান শ্রদ্ধেয় শ্রীঅপূর্বরতন
প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, প্রিয়বন্ধুবর সোমেন ঘোষ, অচ্যুৎ সিংহ, জয় মুখ
আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের শুধুমাত্র উৎসাহি
করেননি, সঠিক পরিচালনার দ্বারা আমাদের গুরু দায়িত্বকে সাফল্যম
করেছেন। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

সত্যব্রত সান্য

ভবেশচন্দ্র

নূপুর গুঞ্জরি যাও

শ্রীত্রিদিবকুমার বসু
দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

॥ ১ ॥

বাস থেকে নেমেই শীতের আচম্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিকটা কেঁপে উঠলাম আমি। খাবারের দোকানগুলো পেছনে রেখে, অফিস আর হাসপাতালের মাঝখান দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, নুড়ি দেওয়া রাস্তাটায় যখন উঠলাম তখন হাঁটার গতিও কমে এল। সুন্দর একটা আওয়াজ হচ্ছে চলার সাথে সাথে। বাঁদিকে ক্লাব ঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম—কেউ নেই। তার পেছনে, খেলার মাঠটাও একেবারে ফাঁকা। শুধু দূরে বাঁধের ওপর দিয়ে দু একজন স্থানীয় লোক চলেছে মাথায় মোট নিয়ে। আজকে হাট বসবে বোধ হয়।···সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার দুপাশে ঘরগুলোয় লোকজন এসেছে কিছু কিছু।··· আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন এই ঘরগুলোর বারান্দায় ধুলো আর শালপাতা স্তূপাকার হয়ে থাকত। এখন অনেকটা পরিষ্কার।···দূরে রাস্তাটার শেষপ্রান্তে ছোট টিলাটার ওপর দোলনাটা দেখলাম নেই।···রাস্তার দুপাশে শাল গাছগুলো অনেক উঁচুতে উঠে রাস্তাটাকে ছেয়ে রেখেছে। নালাটার ওপারে বাংলোর চারপাশে ইউক্যালিপ্টাসের গাছগুলো দেখে তার পাতা মোচড়ানো সুন্দর গন্ধটা মনে আনবার চেষ্টা করলাম···শাল গাছের স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে গেল।···মনে করবার চেষ্টা করলাম আমার ঘরের পাশে কুলগাছটার কুলগুলো কত বড় হয়েছে—পেকেছে নাকি—কিম্বা পাতাগুলো শাদা? শাল গাছের ছায়ায় ছায়ায় আমি অনেকখানি চলে এসেছি। সেই মুহূর্তে আমার যেন মনে হল জায়গাটা বড় সুন্দর। কেমন তপোবন তপোবন ভাব। লোক কিছু বেড়েছে, কিন্তু এ ভাবটা যেন কাটেনি। কেমন নির্জন, শান্ত সমাহিত।

আমি এগিয়ে চলেছি। আর মনে মনে ভাবছি—মামীমা হয়ত ঘুমুচ্ছেন। মামা তো বাড়িতেই নেই। অফিস আছে। মুন্না—মামীমার ছোট মেয়ে—কি করছে কে জানে। বাবুয়া হয়ত ক্লাস ফাইভের সামনের বেঞ্চে বসে একমনে পড়া শুনছে।

॥ ২ ॥

কিন্তু বাড়ির সামনে এসে যার সাথে প্রথম দেখা হ'ল সে মুন্না, বাবুয়া অথবা

মামীমা নয়—মামা তো নয়ই। তাকে আমি চিনি না। আগেরবার য
এসেছিলাম তখন কিন্তু দেখিনি। পাশের বাড়িতে নতুন এসেছে বোধ হ
আমি কিন্তু মনে মনে খুশীই হ'লাম। কারণ তার পরনে একটা গোলাপী শাড়ী
গায়ে একটা আকাশ-নীল সোয়েটার। একটা লম্বা 'লগী' দিয়ে কুল পাড়ছিল
আমাকে দেখে অবাক চোখে থমকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপরেই ছুটে গেল ঘ
ভেতর।

আমি ততক্ষণে মামার বাসার একেবারে সামনে এসে পড়েছি। কিন্তু এ
দরজায় তালা দেওয়া কেন? আমি মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লুম। পরক্ষ
নিজেকে সামলে নিলাম—এই ভেবে—হয়ত দুপুরে খেয়ে দেয়ে সবাই মিলে গা
নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে, বিকেলেই এসে যাবে।

—তুমি কোথা থেকে আসছ?

দেখলাম সেই গোলাপী শাড়ী পরা মেয়েটা আর একজন ভদ্রমহিলাকে নি
এসেছে। বোধ হয় ওর দিদি হবেন। আমি বললাম—কলকাতা থে
সাথে সাথে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—এ বাড়ীর তালা বন্ধ কেন? উ
জিজ্ঞেস করলেন—পরিতোষবাবু তোমার কে হন? আমি বললাম—মামা।

—ওঁরা তো কাল বিকেলেই চলে গেলেন বেনারস। সকালে এক
টেলিগ্রাম এসেছিল—কার যেন খুব খারাপ অবস্থা।

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিদেশে বিভূঁয়ে এই পরিস্থিতিতে অ
কোনদিন পড়িনি। আর পড়বার কথা ভাবতেও পারি না—কারণ সবদিক বি
করে ভেবেচিন্তেই আমি ঘর থেকে পা বাড়াই। এখানে আসার আগেও—আ
স্পষ্ট মনে পড়ল—মামার নামে ছ' পয়সার একটা পোস্টকার্ড আমি ছেড়েছিলা
সেটা তো এতদিনে পৌছনোর কথা। আমি বললাম—কিন্তু আমি যে একটা চি
দিয়েছিলাম, সেটা কি তবে পায়নি?

—কি জানি। বোধহয় পায় নি। পেলে বৌদি নিশ্চয়ই আমাকে বলতে
কিন্তু এ নিয়ে এত চিন্তা করার কি আছে? তোমার মামা-মামী নেই, তাতে
হয়েছে? আমরা তো আছি। চল, আমাদের ঘরে চল। মঞ্জীরা, ওর সুটকেস
নিয়ে আয় তো।

—না, না, আমিই নিচ্ছি। সুটকেসটা নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম
আমার সামনে। একটা বিরাট বোঝা যেন নেমে গেল। সেই সঙ্গে মনে হ
এই মুহূর্তে একটা অতিরিক্ত কিছু যেন পেলাম। মেয়েটার নাম জানা গে
মঞ্জীরা।

আমি পেছন থেকে মঞ্জীরাকে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম। চবি

॥ ৩ ॥

মঞ্জীরার দিদি বলল—ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে। আমি অবাক আর উৎসাহিত হয়ে বললুম—কেন বলুন তো?

—মঞ্জুর জামাইবাবু অফিসের কাজে আজ সকালে চলে গেলেন জে ফিরতে ফিরতে কাল রাত্তির—কি পরশু সকালও হয়ে যেতে পারে। আর জঙ্গলে আমাদের দুজনের থাকতে ভয় লাগেনা বুঝি?—ওর মুখে হাসি—নাও এখন জামা কাপড় পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে এসে বিশ্রাম ধকল যায়নি তা আসতে। তোমার জন্য কিছু খাবার করে আনি।

মঞ্জীরাকে নিয়ে উনি রান্নাঘরে গেলেন। আমি আবার শুনতে পেল সুন্দর পা-দুটির ওপর জ্যোৎস্নালোকিত 'সুবর্ণরেখা'র মত এক জোড়া রিনি স্নিগ্ধ আওয়াজ—ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসেই রইলাম। সাতপাঁচ এলোমেলো কত খেলে গেল মাথার ভেতরে। একবার মনে হ'ল কালই চলে যাব। মঞ্জীরার কথা মনে পড়ল। ভাবনা শুরু হয়ে গেল, কি করে এখানে কয়েক যায়।···মঞ্জীরার জামাইবাবুর কথা মনে পড়ল। মনটা আশায় ভরে ভেবে—উনি যদি কয়েকদিন না আসেন তাহলে এখানে থাকার একটা থাকে। হঠাৎ মঞ্জীরার দিদি এসে আমার মূল্যবান চিন্তায় বাধা দিলেন।

—তুমি এখনও বসে আছ?

আমি তৎক্ষণাৎ জুতো খুলতে লেগে গেলাম।···

॥ ৪ ॥

শেষ পর্যন্ত বেলা তিনটের সময় স্নান করে ফেললাম আমি। মাথা মুছ যখন ঘরে ঢুকছি, মঞ্জীরা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। আমার মু চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে ও চলে গেল। আমি মু সৌজন্যসূচক হাসি ফোটাতে গিয়ে ওর ভাব দেখে গোমড়া হয়ে গেলুম। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের মুখটা ভাল করে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না। দেখতে তো আমি খারাপ নই। তাহলে?

টেবিলের ওপর দেখলাম খাবার দেওয়া রয়েছে। মঞ্জীরা তবে এখনো

এসেছিল একটু আগে।···যেতে যেতে মলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অনু করলাম মঞ্জীরা এদিকেই আসছে। ওর সাথে কথা বলবার জন্য তৈরী হলাম আ মঞ্জীরা চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। কিন্তু কাপটা ওর হাত থেকে নিতে গিয়ে আ যেন মনে হ'ল ওর মুখটা কেমন করুণ। বলব বলব করেও কিছু বলতে পার না। মঞ্জীরাও কিছু না বলে প্লেট আর গ্লাসটা নিঃশব্দে নিয়ে গেল। যাবার শুনিয়ে গেল মলের মিষ্টি আওয়াজটুকু। আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গে মঞ্জীরা কথা বলছে না কেন? আমার দিকে চেয়ে একটুও হাসছে না কেন?···

···ভেবে দেখলাম মঞ্জীরার কাছে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই কার আমার কাছে ও সহজ হতে পারছে না বোধ হয়। মনে হ'ল 'লজ্জা' বস্তুটা ভেতর একটু বেশী পরিমাণেই আছে। তারপর নিজেকে যখন প্রশ্ন করলা তুমিও তো কথা বলতে পারতে। তুমি চুপ করে রয়েছ কেন?—তখন চিন্তার আমি টেনে ধরলাম। নিজের কাছে আমি পরাজিত হতে চাই না।

॥ ৫ ॥

একেবারে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। রাত কটা হ'ল কে জানে। এক আমার চোখে ঘুম আসেনি। ওঘরে মঞ্জীরা আর মঞ্জীরার দিদি নিশ্চিন্তে ঘুমু মঞ্জীরার দিদির কথা মনে করে আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। মনে প মঞ্জীরার ফুল পাড়তে পাড়তে থমকে যাওয়া ছবিটি।···দুটি ডাগর চোখের অব দৃষ্টিপাত।···তারপরেই দৌড়ে যাওয়া—মল বাজিয়ে পায়ের পাতা দুটিতে করে উড়ে গিয়েছিল।···

বিকেলে ক্লাবে যাবার সময় ভেবেছিলাম মঞ্জীরাকে নিয়ে বেরুব। প্রথম দি এতটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হ'ল। ওর দিদিকে বলে একাই বেরিয়ে গেলাম।

রাত্রে খাবার সময় তিনজনই একসঙ্গে বসেছিলাম। তার মধ্যে মঞ্জীরা এ কথাও বলেনি। মঞ্জীরার দিদি কিন্তু আমার সঙ্গে খাওয়ার প্রথম থেকে পর্যন্ত কথা বলেছেন। আমার এবং বাড়ীর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এ একে। আমিও ধীরে সুস্থে বলে গেছি আর চেষ্টা করেছি মঞ্জীরার পরিবর্তন ল করার। কিন্তু না। মেয়েটা আমাকে একেবারে নিরাশ করেছে। আমি নিজে সেই সময় যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম ও আপন হতে। বিশেষ করে মঞ্জীরার। কিন্তু ওর এই রকম নিস্পৃহ মনোভাব, রকম আশ্চর্য অনমনীয়তা আমাকে যেমন অবাক করেছে তেমনি করেছে হতা একবার ভেবেছিলাম মঞ্জীরার দিদিকেই সে সময় ওর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি। কি ভেবে যেন পিছিয়ে গেলাম। বোধ হয় মনে হয়েছিল ওর সম্বন্ধে ওর দি

কাছে জিজ্ঞেস করা—ওর কাছেই একরকম পরাজয় স্বীকার করা। আমি তা হতে দিতে পারি না।

আমি তাই এখন শুয়ে শুয়ে ভাবছি। ভাবছি…

॥ ৬ ॥

মঞ্জীরার মলের আওয়াজ শুনে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন মশারির ভেতর থেকে আমি মঞ্জীরাকে আবছা আলোর মত দেখতে পেলাম। আমার যেন মনে হ'ল, মঞ্জীরার এক অশরীরী আত্মা মল বাজিয়ে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঞ্জীরা পাশের ঘরে চলে যেতেই আমি উঠে পড়লাম। আটটা কখন বেজে গেছে। মঞ্জীরার পরে উঠেছি ভেবে হঠাৎ কেমন লজ্জা পেলুম। মঞ্জীরার দিদি এসে বললেন —রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো? আমি বললাম—দেখে কি তা মনে হচ্ছে না? উনি হেসে বললেন—হুঁ, খুব মনে হচ্ছে, যাও মুখ চোখ ধুয়ে এস।

ঠিক করেছি, সারাটা দিন মঞ্জীরাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলব। ওর জন্য বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করব না। পারি তো ওর মুখের দিকেও তাকাব না। দেখি ওর পরিবর্তন হয় কি না।

একটা পত্রিকার পাতায় অকারণে মনোনিবেশ করার ভান করে, নিজের সুটকেসের জিনিষপত্র অপ্রয়োজনে নাড়াচাড়া করে কিছু একটা খোঁজার অভিনয় করে, নিজেরহাত ঘড়িটা খুলে অভিজ্ঞের মত তার ভেতরের কলকব্জা দেখে—নিজেকে একজন ব্যস্ত মানুষ হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করলাম।…মামার সাঁওতালী চাকরটা যদিও করত, তবু মঞ্জীরার কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য, আমি অনেকক্ষণ ধরে মামার সব্জী বাগানে জল দিলাম, গাছের গোড়াগুলো নিড়িয়ে দিলাম। কলাপাতা ছিঁড়ে অনেকক্ষণ ধরে বাঁশী তৈরী করার ব্যর্থ প্রয়াস পেলাম। যখন একটা ঠিক মত তৈরী হ'ল তখন সেটা আপন মনে বাজাতে বাজাতে কুলগাছের তলায় এলাম। কাল বিকেলে লগীটাকে যে ভাবে ফেলে দিয়ে মঞ্জীরা চলে গিয়েছিল এখনও সেটা সেই ভাবেই পড়ে আছে। আমি আস্তে তুলে নিলাম লগীটাকে। বেছে বেছে কয়েকটা পাকা কুল পাড়লাম। মঞ্জীরার কথা মনে পড়ল আমার। ওকে কয়েকটা দিলে কেমন হ'ত? কি ভেবে তৎক্ষণাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। …ইউক্যালিপ্টাস গাছের কথা মনে হতেই কুল খেতে খেতে কাঠের গেটটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। গেটটা বন্ধ করার সময় চকিতে মঞ্জীরাদের ঘরের জানালায় একবার চোখ বোলাতে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দেখলাম কেউ নেই। কলাপাতার বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

নালাটা পার হয়ে, রাস্তায় পাওয়া কৃষ্ণচূড়ার একটা সরু ডাল দিয়ে রাস্তায়

আঁচড় কাটতে কাটতে, আমি এগিয়ে চলেছি। বাংলোর কাছে এসে কয়ে
ইউক্যালিপ্টাসের পাতা ছিঁড়লাম—কৃষ্ণচূড়ার ডালটা দিয়ে। পাতাগুলো
নাকের কাছে নিলাম। কিন্তু আগের মত ভাল লাগল না গন্ধটা। ফেলে দি
মোচড়ানো পাতাগুলো। পাতাগুলো পড়ে নড়ে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল।
উদ্দেশ্যহীন ভাবে শাল-ইউক্যালিপ্টাস-কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে ঘুরতে
রাস্তায় উঠলাম। ধুলো উড়িয়ে একটা বাস এই মাত্র গেল। একটা নতুন
মাথায় ঢুকেছে। আমার জানার ইচ্ছা হ'ল শেষ বাস কটায় আসে। আমি
জোরে হাঁটতে লাগলাম—বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। আমি হাঁটছি আর ভাবছি ।

॥ ৭ ॥

মঞ্জীরাদের বাসায় যখন ফিরে এলাম তখন এগারটা বেজে গেছে। ঘরে ঢুক
মাংসের গন্ধ পেয়ে মনটা খুশী হয়ে উঠল। মঞ্জীরার দিদি বললেন—কে
গিয়েছিলে ?

—এই বাংলোর ওদিক থেকে ঘুরে এলাম। ভাল লাগল না। একটু
বললাম—ইয়ে, আমি তো আজ রাত্রেই চলে যাব—চলুন না বিকেলবেলা টিল
ওপাশ থেকে ঘুরে আসি।

—কি বললে ? আজ রাত্রেই চলে যাবে ?

—হ্যাঁ, রাত নটায় বাস। এগারটার ট্রেনটা ধরিয়ে দেবে বলল। হাও
পৌছতে পৌছতে এই সকাল আটটা বাজবে। বেশ ভাল সময় না ?

—কিন্তু আর কটা দিন থেকে গেলে পারতে না ? অসুবিধে তো
নাই বা হ'ল মামার বাড়ী—দিদির বাড়ীতো বটে।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না, না, সেজন্য নয়। মামা-মামীর
আপনি কি কম করেছেন ? বরং আপনি যা করেছেন তাতে আপনাকে আরও
আপন বলে মনে হচ্ছে, আর আমি তো এখানে প্রায়ই আসি। জায়গাটা আমার
ভালো লাগে। এই নিয়ে এখানে আমার তিনবার আসা হয়ে গেল। তবেই বুঝু

মঞ্জীরার দিদি নিরস্ত হলেন। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি
এলাম আসল কথায় -তাহলে বিকেলে বেরুচ্ছেন তো ? উনি নিতান্ত অসহ
মত বলে উঠলেন—না, না আমি ওই জংলা পাহাড়ে জায়গায় বেড়াতে পারব
একটু ভেবে তারপর বললেন—তুমি বরং মঞ্জীরাকে নিয়ে যাও।

আমি এইটাই চাইছিলাম। জানতাম টিলার ওপাশে বেড়ানোর কথা
তিনি যাবেন না। আর আজকে আমি চলে যাব শুনলে মঞ্জীরা কিছুতেই অস্থ
করতে পারবে না।

আমি মনের ভাব গোপন রেখে একান্ত অনিচ্ছার ভান করে বললুম—তাহলে আপনি মঞ্জীরাকেই বলুন।

ও স্নান করতে গেছে। তুমিও স্নান করে এস। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর। তারপর ওকে বলে দেখব।

আমি নিশ্চিন্ত মনে স্নানের জন্য তৈরী হতে গেলাম।

॥ ৮ ॥

খাওয়া দাওয়ার পর আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবছি। ···ভাবছি মঞ্জীরা এবারও যাওয়ার সময় একটা কথা বলল না। আমার কাছে ওর অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় ওর মনের মিষ্টি আওয়াজটুকু। তবে কি মঞ্জীরার সঙ্গে কথা বলার অথবা তার কথা শোনার এতটুকু যোগ্যতা আমার নেই? মঞ্জীরার কি এতই অহঙ্কার? কিন্তু না। মঞ্জীরাকে দেখলে তো সে কথা মনে হয় না। বরং সহানুভূতি জাগে। ওর মুখের দিকে চাইলে মনে হয় ও যেন রূপের প্রদীপ জালিয়ে বসে আছে। কেমন করুণ, কেমন পবিত্র যেন। কিন্তু আমার সঙ্গে আমার সামনে ও কথা বলছে না কেন? লজ্জার শক্ত প্রাচীরে এখনওকি সামান্যতম চিড় খাওয়াতে পারেনি মঞ্জীরা?···

কিন্তু বিকেলে? তখন আমি ওকে কথা বলাবই। আমি ভাবতে শুরু করে দিলাম কি ভাবে কথা আরম্ভ করব ওর সঙ্গে। ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে দেখি চারটে বাজে। আশ্বস্ত হলাম—বিকেলটা একেবারে পার হয়ে যায়নি তাহ'লে। আমার ওঠার আওয়াজ পেয়ে মঞ্জীরার দিদি এলেন। বললেন—না, হ'ল না। কিছুতেই পারলাম না। আমি আশঙ্কিত হয়ে বললুম—কি হ'ল না?—মঞ্জীরা বিকেলে বেরবে না বলল। শরীরটা নাকি ভীষণ খারাপ। তুমি কিছু মনে ক'রো না কিন্তু।

দারুণ আঘাত পেলাম আমি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম—মনে করার কি আছে। শরীর যখন ভাল নেই তখন না বেড়ানই ভাল। আমি বরং একাই ঘুরে আসি।

জামা জুতো পরে, বিকেলের টিফিন সেরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভেতরের চাপা রাগে আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম—আমার কানদুটো গরম হয়ে উঠেছে। মঞ্জীরার চালাকি বুঝতে আমার একটুও দেরি হয় নি। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেলাম—এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। মঞ্জীরার মত মঞ্জীরা থাক। আজকে বিকেলেও যদি ও আমার সঙ্গে কথা বলত, তবে এখানে থাকার

প্রশ্নটা একবার ভেবে দেখা যেত। কিন্তু আমাকে যখন ও ঘৃণাই করে তখন এ
থাকার সার্থকতা কোথায়? এই মুহূর্তে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা না করে
পারলাম না। কেননা এখান থেকে যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব আমি আগেই
রেখেছি। ফলে মঞ্জীরার দিদির তরফ থেকে আর কোন শক্ত বাধা আসবে
বোধ করি।

মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ক্লাবে বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে
তাড়াতাড়িই ফিরে এলাম। জিনিষপত্র সুটকেসে গোছাতে সুরু করতে, মঞ্জী
দিদি এসে বললেন—কি হ'ল সুটকেস গোছাচ্ছ যে? সত্যিই তুমি চ
তাহলে? আমি বললাম—হ্যাঁ, নটার বাসেই যাব। আর আগে থেকে গু
না রাখলে আমি ঠিক থাকতে পারি না।

কিছু না বলে উনি পাশের ঘরে গেলেন। নিয়ে এলেন বেশ কিছু হরীতকী
আমলকী। বললেন—এগুলো নিয়ে যাও, মাকে দিও। আমি না করলাম
সুটকেসের চারপাশে ভরতে ভরতে আমি বললাম—মা খুব খুশী হবে
সুটকেসটা বন্ধ করতে করতে আমি মঞ্জীরার মলের আওয়াজ শুনতে পেলাম।
এ ঘরে ও এল না। আমার কান দুটো আবার গরম হয়ে উঠলো।

॥ ৯ ॥

.....সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে দরজায় তালা দিয়ে আ
তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। মঞ্জীরার দিদি আর আমি, সামনে মঞ্জীরা ওর দি
পাশে একটু পেছনে মাথা নীচু করে চলেছে। আমি ওকে ভালভাবে দে
পাচ্ছিলাম না। শুধু ওর মলের শব্দটুকু আমার কানে এক অস্বস্তিকর আওয়া
মত আঘাত হানতে লাগল।

বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন নটা বাজতে দশ। বহু দূরে বা
আলো দেখা গেল। মঞ্জীরার দিদি বললেন—মঞ্জুর জামাইবাবু এই বাসেও আ
পারেন। আমি মনে মনে খুশী হলাম।

বাস এল। ভীড় তেমন নেই। কয়েকজন নেমে যাওয়ার পর আমি উ
যাব, এমন সময় মঞ্জীরার দিদি আমাকে ডেকে বললেন—অমল, এই যে তো
জামাইবাবু। আমি প্রণাম করলুম। জামাইবাবু আমায় নানা কথা জি
করলেন। অবশেষে থেকে যাওয়ার কথা বললেন। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিল
মঞ্জীরার দিদিকে যে কথা বলেছিলাম তাঁকেও সেই অস্ত্রে কাবু করলাম।
আর বাক্যব্যয় না করে, বাসে উঠে একটা জানলার ধারে বসে পড়লাম।

বাসে তেমন আলো নেই। আমি বাস থেকে মঞ্জীরাকে দেখতে পা

ও তার দিদি আর জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দিদি জামাইবাবুকে ডেকে নিয়ে কি যেন বললেন, তারপর দুজনেই একটু দূরে খাবারের দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে একি! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? মঞ্জীরা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আশান্বিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ওর মুখটা যেন আরও বেশী করুণ দেখাচ্ছে। কিছু না বলে ও একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি আগ্রহের সঙ্গে ওটা নিলাম। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ও সরে গেল। ভাঁজ করা কাগজটা হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে ধরে আমি ওর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম। রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। কাগজে কি আছে আমার দেখতে ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু ফেলে দিতেও পারলাম না। হাত খুলতেই মোচড়ানো কাগজটা একট নড়ে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। মঞ্জীরার জামাইবাবু আর দিদিকে এদিকে আসতে দেখে, আস্তে ওটাকে পকেটে রেখে দিলাম আমি।

একটা কাঁচা শালপাতার বড় ঠোঙা আমার হাতে দিয়ে জামাইবাবু বললেন—এটা ধর। খাবার আছে। রাত্রে খিদে পাবে। আমি বললাম—এগুলো আবার কি করলেন। মঞ্জীরার দিদি বললেন—কিছু করিনি। এখন ঠিক হয়ে বস তো। বাস এখনি ছাড়বে। জামাইবাবু বললেন—আবার এস। আমি বললাম—ছুটি পেলে আসব।

বাস ছেড়ে দিল। হঠাৎ আমার মঞ্জীরার কথা মনে পড়ল। কিন্তু বাস অনেকখানি চলে এসেছে। আমার মনটা কেমন করে উঠল। আবার মনে হ'ল কি হবে দেখে? ভালই হয়েছে। আমাকে যে ঘৃণা করে তার জন্য এত মাথা ব্যথা কিসের।

কিন্তু তবুও ত মঞ্জীরাকে মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারছি না। কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মত ও আমার স্মৃতির, আমার মনের এক বিরাট অংশ জুড়ে বসে আছে। কিছুতেই তার ঘোর থেকে নিজেকে কাটিয়ে উঠতে পারছি না।··· মঞ্জীরার দেওয়া কাগজটার কথা মনে পড়ল আমার। ভীষণ ইচ্ছা হল ভেতরে কি আছে দেখবার জন্য। বাসের ক্ষীণ আলোয় অতি সংগোপনে কাগজটা খুলে ধরলাম আমি।

অমলদা,

আমার ওপর আপনি ভীষণ রাগ করেছেন না? আমি আপনার সঙ্গে আজ বিকেলে বেড়াতে যাইনি। আপনার সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। জানি না আমার সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমার যে এ না করে উপায় ছিল-না অমলদা। আমি যে বোবা। আমার বয়স যখন সাত সেই সময়

আমি কথা বলার শক্তি হারিয়েছি। সে এক ছোট্ট দুর্ঘটনার ইতিহাস। সে ক
আজ আর নাই বা শুনলেন।

কিন্তু সাত বছর বয়সে আমিও আর পাঁচটা মেয়ের মত কথা বলতে পারত
হাসির কথা শুনলে হেসে উঠতাম। যখনই ইচ্ছে হ'ত তখনই আপন মনে গে
উঠতাম। আর মা যেদিন মারা গেলেন সেদিন আমিও চীৎকার করে কেঁ
ছিলাম। কিন্তু আজ আর তা পারি না। বিশ্বাস করুন, শত চেষ্টা করলেও আ
আর আমি তা পারব না।...

আমি আর পড়তে পারলাম না। অন্তশোচনায় আমার ভেতরটা মোচড় দি
উঠল। তীব্র যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। নিজেকে এক বাণবিদ্ধ আ
বাজের মত মনে হ'ল। মাথা নীচু করে আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।...

॥ ১০ ॥

বাস থেকে নেমে নিজেকে রিক্ত আর সেই সঙ্গে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হ'
সমস্ত স্টেশনটা অন্ধকার। শুধু স্টেশন মাস্টারের ঘরে আর ঘরের বারান্দায় দু
ল্যাম্প টিম্ টিম্ করে জলছে। তার ওপরে শীতের ঘন কুয়াশা অন্ধকার আরও বাড়ি
তুলেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটাও তারা নেই। আকাশ ছে
কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে। চারদিকে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব।

অবসন্ন দেহে ষ্টেশনের একটা বেঞ্চে মাথা নীচু করে আমি বসে পড়লাম। হঠ
চোখ বুজে আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার আশে পাশেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
যেন মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার ভেতরটা গুমরে উঠল।

তারা নয় জোনাকি

শ্রীভগীরথ মিশ্র
দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

বিকেল পড়োপড়ো। গাঁঝের স্নিগ্ধ আমেজ ভরিয়ে ফেলেছে বাগমারা শহরে
আকাশটা। পড়ন্ত রোদের সোনালী কয়েকটুকরো তখনও মিলের ওপারের
গাছটায়। ওপারে স্টেশনের কাছে শুকনো অশ্বত্থ গাছটায় কাকের কলরব। ওদে

অশ্রান্ত কিলবিল ডাক এখনও কানে বাজছে। নিজের খেয়ালে কখন যে মহিষের খাটাল পেরিয়ে জৈন মন্দিরটা ছাড়িয়ে—পুলের কাছাকাছি এসে গেছি নিজেই জানি না। বি, এ, পরীক্ষাটা সামনে। তাই কি একটা প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে এত উদাস হয়ে পড়েছিলুম। মিলের বাঁশীটা বিকট স্বরে বেজে উঠলো। বাপরে, কি কানফাটা চিৎকার! সাড়ে চারটে বেজে গেছে। এবার ওদের ছুটি। হয়ত মজুররা এতক্ষণে নিজেদের মাথার পাগড়ি খানা···না, পাগড়ি বললে ভুলই হবে। শতছিন্ন গামছাখানা জোরে নাড়ছে। ঘাম জিরোবার জন্য, মেয়েরা ময়লা শাড়ী দিয়ে ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছছে। মিলের গেটের কাছে পৌছে গেছি। দলে দলে মজুররা বেরুচ্ছে। মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকের কোলে একটিকরে বাচ্চা। এতদূর আসার কোন কারণ ছিল না। এমনি নিজের খেয়ালেই এতদূর চলে এসে-ছিলুম। এবার ফিরব। ভোঁ করে পাঁচটার ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। তার ঝক্‌ঝক্ আওয়াজ এখনও কানে বাজছে। না, আর নয়। এবার ফিরতে হবে। ফিরে হাঁটতে শুরু করি।

—ও বাবু, পালাচ্ছু কেনে? ছোটবাবু, দাঁড়া' গো—একটি মেয়েলি ডাক।

—ছোটবাবু! বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে। পিছন ফিরে দেখি একটি মেয়ে ছুটে ছুটে আসছে আমার দিকে, চেনা চেনা লাগছে যেন। স্মৃতি রোমন্থন শুরু করে দিলুম। কোথায় যেন দেখেছি ওকে।

'কি গো চিনতে পারছু নাই তো? ঠিক ধরছি মুই, চিনতে পারবু নাই,' এতক্ষণে ও কাছে এসে গেছে। কুচকুচে কালো একটি সাঁওতালী মেয়ে, যৌবনের ছাপ ফুটে বেরুচ্ছে, তাকে সুন্দরী বলা চলে। কারণ এ এক অন্য রকম সৌন্দর্য। বড্ড চেনা লাগছে যেন।

'কি গো এখনও পারলু নাই, মুই টুংরী, হেই যে তুই বেড়াতে গেলি। এবার সমস্ত ব্যাপার জলবৎ পরিষ্কার হলো, ও টুংরী। আমরা সেবার বেড়াতে গিয়েছিলুম ধানবাদে, বিহারের ছোট এক গ্রামে। ওখানে আমাদের যে কাজকর্ম করত, ও তারই মেয়ে। কাছে সাঁওতাল পাড়া। মাঝি কুলীতে থাকত ওরা। তা ও ওখানে কেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পারছি বই কী। তা টুংরী তুই হঠাৎ মিলে কাজ করতে এলি কেন? তুই তো মিলের চাকুরীকে ঘেন্না করতিস্—বললাম আমি।

হঠাৎ টুংরীর মুখখানা চুপসে কালো হয়ে গেল। বললে—আসব নাই তো করব কি?

—করব কি মানে? বললাম আমি।

'সে সব অনেক কথা আছে। আইজ মুই যাই, পরে বলবো তোরে।

ছেলেটার বড্ড জ্বর। আমাদের বাড়ীতো তুই যাবি নাই।' বললে ও।
বুঝা গেল ও কি একটা অতি সাবধানে চেপে গেল।

বাড়ী ফিরে চললাম। টুংরীর কথাগুলো তখনও বুকে বাজছে। আজ ও
অন্য মানুষ। এত নোয়া মেয়ে ত ও কোনদিন ছিল না। সেবারে হ ম
জন্য খাসুভীতে বেড়াতে গেছলুম। তখন আমার বয়স বেশী নয়। ও তখন অ
ছোট। ঐ ছোট অবস্থাতে লাল ফুল কাটা শাড়ী পরতো ও। সুন্দর দেখাত
সবার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো। একদিন ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছি
হঠাৎ জানলার বাহির থেকে ডাক—ছোটবাবু, ও ছোটবাবু ওঠ্। এখনও উ
নাই। চোখ মেলে চাইলাম। দেখলাম বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা
কালো মেয়ে। কালো কালো চোখে যেন রাজ্যের কৌতুক। হাতে বড়
খাড়ু। আমি যে "ছোটবাবু" সেইদিন সেটা আবিষ্কার করলুম।

'তুমি কে?' ঘুম ভাঙতেই জিজ্ঞেস করলুম।

টুংরী একটা ছোট উত্তর। আর ঠোঁটে একটু হাসি।

—বিকেলে এস চকোলেট দেব—বললাম আমি।

মেয়েটা নড়ে না তবু। কি কিছু চাও?—বললাম আমি। মুখে কিছু না
ও আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সদ্য ফোটা সিজন্ ফ্লাওয়ারটার দিকে। ফুল চায় ও

'একটা নিয়ে যা, কি করবি?' উত্তরে দেখিয়ে দিল ও মাথার খোঁপাটার দি
যেখানে এখনও কয়েকটা শুকনো পাতা গোঁজা রয়েছে।

—বড়বাবু বকবে নাই।

—না বক্‌বে কেন।

ফুল নিয়ে খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে আনন্দে চলে যায় ও।

তারপর প্রতিদিনই অন্ততঃ একবার করে ও আসত আমার ঘরে। টুকি
কাজ করে দিত। ফুলও নিয়ে যেত, ওর মুখেই একদিন শুনেছিলুম ওর বাব
বিয়ে দেবেন প্রতিবেশী পুত্র বাঁকার সাথে। বাঁকা সাঁওতাল। বাঁকা নাকি
লেখাপড়াও জানে। মাঠের কাজে ও দক্ষ। শিকারে অব্যর্থ হাত। আর তা
খুব কম খায়। এদের জাতে এর চেয়ে ভাল পাত্র হয় না। সেদিন ওর অ
দেরী দেখে প্রশ্ন করি, 'কিরে টুংরী এত দেরী যে?'

উত্তর দিতে গিয়ে টুংরীর চোখে কয়েকবার বিদ্যুৎ খেলে গেল।—আজ ব
সঙ্গে ভেট্ হইছিল গো। পাখি ধরে আমাকে খাওয়াইলো নিজেও খাই
তাইতো তো দেরী হই গেল।

—আচ্ছা—, বললাম আমি। তারপর শুনতে বসলাম তার কাছে বাঁকার প্রশ
তার নাকি এ পর্যন্ত তিনটে লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে, সে নাকি টুংরীকে কয়েকবার নে

ছা দেখিয়ে এনেছে, তার বাঁশী শুনলে নাকি প্রাণ "মাতাল" হয়ে যায়। সকলের শেষে সে মাথার ঝাঁকড়া চুলে গাছের লতাপাতা জড়ালে তাকে নাকি কিষ্টু ঠাকুরের মত দেখায় ইত্যাদি। টুংরী কথা বলে আর হিঃ হিঃ করে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। আর একসময় ছুটে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে। ভারি ভালো লাগতো ওদের পবিত্র মনের ভালবাসাকে, কোনরকম পঙ্কিলতা যাকে স্পর্শ করেনি।

শেষপর্যন্ত বাঁকাই ওকে বিয়ে করল। খুব জম-জমাট উৎসব করে করে টুংরীকে বিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ। টুংরী কিন্তু একফাঁকে এসে ব্যাপারটা জানিয়ে গিয়েছিল আমাকে আকারে ইংগিতে।

'বিয়ের পর কি করবি টুংরী? মরদকে নিয়ে চলে যাবি মিলে কাজ করতে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

—ছিঃ মিলে যাবা কেনে গো? সেখানে মানুষ যায় নাই বটে।

—কেন?

—হোথায় মানুষের ইজ্জত থাকে নাই গো। সেথা যাবো কেনে?

—তাহলে করবি কি?

—কেনে গো, নদীর ধারে বাসা বাঁধবো। 'মরদ'টারে শিকার করতে পাঠাব। বাড়ীর পাশে ফসল লাগাইবো।

—ব্যস্ ব্যস্, এই? আর কোন কাজ নাই?

—হুঁ। ওর মুখে ঈষৎ হাসি।

—আর কি করবি?

—ঘরে বসে মরদটার বাঁশি শুনব দিন রাইত। আচ্ছা বাজায়।

আশ্চর্য হলাম ওর ঘর বাঁধার রঙিন স্বপ্ন দেখে। কতো বা বয়েস—বার কি তের।

পরদিন বিকালে গেলাম মিলের কাছে। সবদিনের মতো পাঁচটায় গাড়ীটাও বেরিয়ে গেল। সকলের সঙ্গে টুংরীও বেরুলো। মুখে তার আসন্ন ঝড়ের সংকেত। আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেল। তারপর বাঁধভাঙা বন্যার মতো হুহু করে কাঁদতে লাগলো।

—কি ব্যাপার টুংরী? কি হোল তোর?

—মোর সব লিয়েছিল বাবু বাচ্চাটারে ও ফিরাই দিলে নাই।

—কেন? কি হয়েছে তার?

—যমরাজের দৃষ্টি এড়াইলো না বাবু, এড়াইলো না।

ধুঁকতে লাগলো সে। তারপর যা বললো তার মর্মার্থ, ছেলেটির কয়েকদিন খুব অসুখ হয়েছিল। গতকাল রাতে সে মারা গেছে।

আহত হয়েছি যথেষ্ট। তবুও জিজ্ঞেস করলাম—তুই এখানে কেন টু
তোর স্বামী কোথায়? বাঁকা?

—ওর কথা বলিস নাই বাবু, আমি মরব তা'লে।

—কেন হলো কি তার?

—বিয়ের পর ভালো ছিল বাবু। তারপর জুটলো মংলীর সঙ্গে।

—মংলী কে?

—ও বাবু, তাও জান নাই? হুই সর্দারের বিটি গো।

—ও—তারপর?

—তাড়ি-খাবা ধরলেন, মংলীরে বাঁশী শুনাইলেন। ঘরে রইতো না বাবু
মানা করলে মোরে পিটাইতেন।

—তা তুই চলে এলি কেন?

—আসব নাই? আসব নাই কেনে? হেটা মংলীরে বাঁশী শুনাইবে—
থাকবে, পাখীর ছা পেড়ে দেবে, আর মুই থাকবে। কেনে?

তারপর ও অনেক কথাই বললে। বাঁকা মংলীর রূপে ভুলেছিল। টুংরীকে
মারধোর করতো, নানা অত্যাচার করতো। তাই ও রাগে—অভিমানে
এসেছে।

—বাঁচতাম নাই বাবু, মরি যেতাম, মরলাম নাই হেটার ত
বললে ও।

—কার তরে?

চোখ ফেটে জল আসে ওর। বললে—ও হোটা, যমরাজ যারে ছিনাই লই
কাল। বলে ও মুখে আঁচল চাপা দিল।

আমি যেন বোবা হয়ে গেলুম। বাকশক্তি রহিত হয়ে পিছন ফিরে হা
লাগলাম। একটু গিয়ে ফিরে দেখি টুংরী তখনও ফুলেফুলে কাঁদছে। কি
হ'ল আবার ফিরলাম ওর কাছে। গিয়ে বললাম—চল্ টুংরী, আমার ওখানে
থাকবি, খাবি দাবি। মিলে থেকে পোষাবে না তোর।

কিছুক্ষণ পরে টুংরী মুখ তুললো। মুখে তার ফুটে উঠলো এক অব্যক্ত হ
আস্তে আস্তে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে।

পরদিন গেলাম পাঁচটায়। টুংরীকে নিয়ে আসতে। মেয়েটার জন্য মায়া
মিলের কাছাকাছি এসে গেছি। মিলের বাঁশিটা বেজে উঠলো। যেটাকে যে
এত বিকট লাগছিল আজ সেটাকে যেন কতো মধুর মনে হলো। মিলের
অভিশপ্ত জীবনের মুক্তির বাঁশি এটা। পাঁচটার ট্রেনটাও চলে গেল। সব

বেরিয়ে এল। সিনেমায় গান দিল, ছটার শো আরম্ভ হলো। মিলের গেটে চাবি পড়লো। কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম, সে আজ দেনপাওনা চুকিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

শুভা

শ্রীসুমিত্রকুমার রায়

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

শুভা হয়ত কাঁদছিল না। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ও কাঁদছিল না। কেননা কান্না ওর আসে না। আসতে চায় না। কিন্তু কান্নারই মত যেটা তার হৃদয় মথিত করে উঠতে চায় তার নাম কী? সেটা কী কান্নার চেয়ে ভয়ঙ্কর? শুভা তা জানে না।

শুভাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ও ভাবছিল বাস-ট্রামের ভীড়ের কথা। রোজ অফিস যাবার আর আসবার সময় সেই অসহ্য ভিড় তার আর সহ্য হয় না। অথচ এর থেকে কী মুক্তি আছে শুভার?

আজ শুভার এখনই বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছিলো না। ময়দানে একটু বসতে ইচ্ছা হয়েছিল তার। দেখতে ইচ্ছে করছিল কলকাতার আকাশকে। কিন্তু ট্রাম থেকে নামতেই ভুলে গিয়েছিল শুভা। আর এখন—এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বসে তার মনে হচ্ছে, ট্রাম থেকে নামার কথা সে ভুলে গেল কেন? তা নাহলে তো আরও কিছুক্ষণ মানসের দৃষ্টির আড়ালে থাকা যেত।

মানস! নামটা মনে আসার সঙ্গে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করল শুভা। অথচ মানস তার স্বামী।

পাঁচমাস কী তারও কিছু বেশী মানস আর চাকরি করে না। কেননা চাকরি করার ক্ষমতা তার আর নেই। একটা কঠিন অসুখে মানস শয্যাশায়ী। এ অসুখের সঙ্গে শুভার পরিচয় ছিল না কোনওদিন। আর তাই যত দিন যাচ্ছিল শুভা ততই হাঁপিয়ে উঠছিল। ও যেন আর মানসকে সহ্য করতে পারছে না। শুভা বেশ বুঝছে একটা মৃত্যুর ছায়া কাঁপছে তার সামনে। অথচ আশ্চর্য। শুভার তাতে কোন ভয় নেই। ও যেন সত্যিই মুক্তি চাইছে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে।

শুভা গা ধোবার জন্য উঠছিল। এমন সময় ও মানসের ডাক শুনতে
শুভা গামছাটা হাতে নিয়ে উঠল। শোবার ঘরে গিয়ে ও মানসের খাটের স
দাঁড়াল। বলল, "বলবে কিছু ?"

মানস শুভার ক্লান্ত মুখটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, "তে
কত কষ্ট হয়, কত কষ্ট হচ্ছে।"

মানস একথা শুভাকে প্রায়ই বলে। নিজের জীবনের প্রতি ওর ধিক্কার
গিয়েছে হয়ত

শুভা বলল, "কষ্ট কী। আমার যদি অসুখ হোত তাহলে তোমার কি
হোত ?"

"আর অসুখের কথা বলোনা শুভা। অসুখ যেন তোমার কোনওদিন না
খুব বিষণ্ণ শোনাল মানসের কথা।

একটু স্নান করে আসি, বলল শুভা। তারপর তোমায় ওষুধ দেব।

শুভার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামের দিকে তাকাল মানস। বলল, "হাঁ, যাও

আস্তে আস্তে চলে গেল শুভা। ওর চলে যাবার পথের দিকে একদৃষ্টে তা
রইল মানস।

শুভার রাঁধতে ইচ্ছে করছিল না। অসহ্য ক্লান্তি তার শরীর মনকে
করছিল। তবুও সে মানসের জন্য স্টোভে বার্লি জ্বাল দিল।

শুভা আজ কিছুই খেল না। ওর যেন খাওয়ার কথা মনেই আসছিল
ও শুধু ভাবছিল আজ রাতটার কথা। প্রতিরাতের কথা তার মনে
একটা মরনাপন্ন প্রাণের সাথে এক বিছানায় শুতে ও যেন আজকাল কেমন
পাচ্ছে।

শুভার চোখে আজ ঘুম আসছিল না। ও জানলা দিয়ে আকাশের
শুনছিল। বাতাস ওর চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল।

মানস ডাকল, শোবে না শুভা ?

আর তখনই যেন মনে মনে চমকাল শুভা। বলল, হ্যাঁ এইবার শোব।

আস্তে আস্তে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিল শুভা। বিছানাটা গরম মনে
তার। মানসকে বলল, আর জেগে থেকো না। অনেক রাত হয়েছে।

ঘুম যে আসে না, শুভা। তোমার কথা মনে হয়, জীবনের কথা মনে
ভাবি জীবনের সার্থকতা কোথায় ?

আর ভেবোনা। এবার ঘুমোও। আমিও ঘুমোব। শুভা এ প্রসঙ্গে
সমাপ্তি টানতে চাইল।

মানস বলল, হাঁ, শুভা তুমি ঘুমোও। তোমার ঘুম দরকার।

তারপর অনেকক্ষণ ওদের কোন কথা হোল না। কোথায় যেন ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ হোল। ওরা দুজনেই তা শুনতে পেল। আসলে তারা কেউ তখনও ঘুমোও নি। মানস ভাবছিল শুভা ঘুমিয়েছে, আর শুভা ভাবছিল মানস ঘুমিয়েছে।

মানস তার স্ত্রীর কথা ভাবছিল। কত কষ্ট হচ্ছে শুভার রোজ। শুভাকে আজ একটু আদর করতে ইচ্ছে করছিল। অন্ধকারে শুভাকে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না মানস। আন্দাজে স্ত্রীর কপালে হাত রাখল মানস।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিম হয়ে যাচ্ছিল শুভা। একটা রুগ্ন, কঙ্কালসার হাতকে ও দেখতে পাচ্ছিল। ও যেন কল্পনা করছিল একটা সরীসৃপকে। সমস্ত মুখ শুভার ঘেমে উঠল। চোখেমুখে জল দেবার জন্য সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

আর মানস নিজের ভিতরে নিজেই যেন কুকড়ে গেল। ও যেন হঠাৎই আবিষ্কার করল, শুভা তাকে আর সহ্য করতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করল মানস। নিজের অসুখের কথা ভাবল আর একবার। সে জানে যত ওষুধই তার জন্য আনা হোক, সেগুলো কোনই কাজে লাগবে না। তিল তিল করে তার মৃত্যু হবে।

চোখের কোনাদুটো জ্বালা করে উঠল মানসের। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে।

পরদিন সকালে মানসেরই আগে ঘুম ভাঙল। শুভার দিকে চোখ ফেরাল মানস। শুভা তখনও ঘুমোচ্ছিল। একটা হাত কপালে আর একটা হাত বিছানার উপর। যেন খুব একটা ক্লান্ত ভঙ্গি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। মানসের হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে শুভার হয়ত অফিসের দেরী হয়ে যাবে। শুভাকে ডাকবে কিনা ভাবছিল এমন সময় মানসের মনে পড়ল যে আজ রবিবার শুভার অফিস সেই।

তাহলে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোক শুভা। ভাবল মানস। আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুল মানস। ওর মাথায় কেমন যেন একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল।

সেদিন অফিসের কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না শুভা। এক অসহ্য ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি তার আর ভাল লাগছিল না। ও জীবনের কিছু আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছিল। আনন্দ? মনে মনে হাসল শুভা। আনন্দ তো সে কবেই হারিয়েছে। অথচ তার বয়স তো মোটে উনত্রিশ। এ বয়সে সে কী একটু কিছু আনন্দ চাইতে পারে না?

একটা নিঃশ্বাস ফেলল শুভা। আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠল ও। অফিসের ছুটি হয়েছে। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিল শুভা।

ট্রামে উঠতে গিয়ে তার মনে পড়ল মানসের জন্য একটা ওষুধ কেনবার আজ। শুভার ট্রামে চাপা হোল না।

ওষুধের দোকানে গিয়ে ওষুধ কিনল শুভা। শুভা জানে কোন ওষুধই কাজে লাগবে না। তবুও ও কিনল।

দোকান থেকে বেরিয়ে ও ফুটপাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ ক শুভার চোখে পড়ল রাজভবনের সবুজ গাছগুলো, মাথার উপরের নীলিম আকাশ সে একবার দেখবার—চেষ্টা করল। সব ঠিক আছে। ভাবল শুভা। গাছগু সজীবতা, আকাশের সেই প্রসন্নতা, লোক চলাচলের ব্যস্ততা—সব, স-ব ঠিক আ শুধু সেই ঠিক নেই। মানসই তাকে ঠিক থাকতে দিল না।

বাড়ী ফিরে শুভা দেখল মানস জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে চুপচাপ।

মানসের কাছে গিয়ে বসল শুভা। ওষুধটা রাখল টেবিলের উপর।

"এখন কেমন লাগছে তোমার?"

"ভাল না শুভা, ভাল না"—একটা কান্নাভরা বেদনা যেন গুমরিয়ে উঠল। "বেশ বুঝতে পারছি মৃত্যু একেবারে কাছে। কিন্তু শুভা মরতে চাই না আ মরতে চাই না। অন্তত তোমার জন্যও আমায় বাঁচতে দাও।" শুভার হাত ধরে কেঁদে উঠল মানস।

শুভা কোন কথা বলতে পারছিল না। তার হৃদয় যেন যন্ত্রণায় ছ করছিল।

মানস আবার বলল, "তোমার জীবনের সমস্ত হাসি, গান আমিই বন্ধ কর শুভা। জীবনে কিছুই পেলে না তুমি।"

মানস কী আজ শেষ কথা বলতে চায়? শুভা ওকে শান্ত করতে পারছিল শুভা বলল, "ওষুধ খেতে হবে তোমায় এখন।"

"ওষুধ?" একটা দুঃখের হাসি হাসল মানস। "ওষুধ খেয়ে কী হবে শু তুমিও জান, আমিও জানি ওষুধ খেয়ে আমার আর কোন লাভ নেই।"

মানসের কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুভা কাচের গ্লাসে লাল রঙের ও ঢালল। তারপর মানসের কাছে গিয়ে বলল, "এটা খেয়ে ফেল।"

মানস গ্লাসের ওষুধটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, লাল রঙ দেখেছ ওষুধটার? আমার বুকের রক্ত কী এরকম লাল?"

শুভা কাঁপছিল, শুভার হাতটাও কাঁপছিল। মানসের এরকম এলো বিহ্বলতা সে আর দেখেনি।

শুভার হাত থেকে এবার গ্লাসটা নিল মানস। তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল মাটি কাঁচের গ্লাস ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙ্গে গেলে। ওষুধটা গড়িয়ে গেল মেঝেতে।

শুভার সমস্ত দেহটাই এবার থরথর করে কেঁপে উঠল। ও দুহাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ল। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল।

দিনটা ছিল সোমবার। সেদিনই সেই চরম দুর্ঘটনাটা ঘটল।

সকালে মানসকে ঘুম থেকে জাগাতে গেল শুভা। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই চমকে গেল শুভা। তাড়াতাড়ি মানসের বুকে হাত রাখল ও। ঠাণ্ডা, শীতল বুক। যেখানে কোনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল না, আর কোনওদিনই যাবে না। কে জানে কখন মানস এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল! হয়ত রাতের নিঝুমতার মধ্যে সে হঠাৎ চুপিচুপি চলে গেল, কিংবা এই প্রত্যুষেই, শুভার ঘুম ভাঙার আগেই মানসের প্রাণ চলে গেল অন্তিমলোকে, শুভাকে মুক্তি দিয়ে গেল।

মানস! প্রচণ্ড এক মর্মভেদী চীৎকার তুলল শুভা। আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে গেল তার মুখ। এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে মুক্তি চেয়েছিল শুভা। কিন্তু এই কী সেই মুক্তি?

"না--না-না এ মুক্তি আমি চাই নি। মানস, এ মুক্তি আমি চাই নি।" চীৎকার করে বলতে চাইল শুভা। কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা বেরুলো না। সব যেন স্তব্ধ।

এই মুহূর্তের বৈধব্যযন্ত্রণা তার আর সহ্য হচ্ছিল না। শুভা উপলব্ধি করল পৃথিবীতে সে একা হয়ে পড়ল।

শুভা আর কান্না চাপতে পারল না। হু হু করে কেঁদে উঠল ও। "মানস! মানস! আমায় তুমি ফাঁকি দিলে। আমায় একলা রেখে গেলে। মানস, তোমার এ মৃত্যু আমি চাই নি—এ মৃত্যু আমি চা-ই-নি।" শুভার কান্না আর থামতে চাইছিল না।

বর্ণালী অন্ধকার

শ্রীশংকর দাসগুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

শেষ সকালের সোনালী রোদ্দুরটুকু মিলিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দুপুর এখন নি
হ'য়ে আসছে। বাইরের সজনে গাছ পেরিয়ে একঝলক রূপোলী রোদ্দুর আ
পড়েছে বড় টেবিলটার ওপর। ছোট্ট হাই-হীল সময়ের পা'য়ে। অনা
সেকেণ্ডের স্পাইরাল সিঁড়ি টপকে যাচ্ছে। বারান্দায় প্রহরীর ভারী বুটের আও
শোনা যাচ্ছে। ডিউটী আওয়ারস প্রায় ফুরিয়ে এলো। ক্লান্তির ছোঁয়া ওর
পদক্ষেপে।

আমারও কেমন ক্লান্তিবোধ হ'চ্ছে। একগাদা ফাইলের সামনে ব'সে মা
ভারীভারী লাগছে। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে।

—আসতে পারি? অফিস রুমের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক। প্রে
পরনে একটা ময়লা কাপড় এবং ততোধিক ময়লা গেরুয়া-রং পাঞ্জাবি। হাতে
কাগজপত্র। চোখে সেল ফ্রেমের মোটা একটা চশমা। মুখে একটা স্নিগ্ধ, সৌম্যভ

—আসুন।

—নমস্কার। আচ্ছা অসীমবাবু নেই বুঝি?

—না উনি একটু বেরিয়েছেন। আসবেন এক্ষুনি। আপনি বসুন।

—ধন্যবাদ। বসলেন, আপনি বুঝি নোতুন এসেছেন? আগে তো—

—হ্যাঁ আমি এখানে নোতুন।

—বেশ-বেশ খুব ভালো। একটু থামলেন, আমার সাথে অসীমবাবুর প
অনেকদিনের। উনি একবার আমাদের পাড়ায় একটা তদন্ত করতে গিয়েছি
সেখানেই—

—ও আচ্ছা। আমি সায় দিই. আপনার সাথে মানে ওখানেই—

—আলাপ হয়েছিল। পাদপূরণ করেন ভদ্রলোক। একটু থামেন,
একটা সোনার দোকানে কাজ ক'রতাম—, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে
ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর, কিন্তু গোল্ডকনট্রোল শুরু হ'ল। চাকরিটাও গেল।...অ
অনটনের সংসার, তার ওপর যা দিনকাল।...কণ্ঠস্বরে কেমন যেন পাণ্ডুরতা, অ
খুঁজে, অনেক পরিশ্রমে লাইফইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী পেয়েছি, তাই দিয়ে
রকমে—, ম্লান একটু হাসলেন ভদ্রলোক।

—অসীমবাবুকে আপনার কিসের দরকার? কোন কেস-টেস আছে নাকি?

—না, না কেসটেস কিছু নয়। ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত বোধ করেন, আমাদের মতো গরীব লোক আবার কেস করবে কি? আর আমরা তো এমনিতেই হেরে গেছি, আমরা তো পরাজিতের দল—, বেদনাময় একটু হাসি হাসলেন ভদ্রলোক, না না কেসটেস কিছু নয় আমি এসেছি, মানে, যদি···মানে অসীমবাবু যদি একটা ইনসিওরেন্স করান আমার কাছে।··· একটু থামলেন ভদ্রলোক। চেয়ারটাকে একটু আমার দিকে টেনে আনলেন। একটু ইতস্তত করলেন। টেবিলের ওপর রাখা ওয়েটপেপারটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেন। আবার রেখে দিলেন। দু' একবার তাকালেন আমার দিকে। দেখলাম চশমায় ঢাকা চোখের পাতাগুলো অসম্ভব কাঁপছে এবং একটুক্ষণ পরে—

—আর যদি কিছু মনে না করেন বললেন আমার দিকে সেই অসম্ভব কাঁপা-কাঁপা চোখে চেয়ে আপনি, আপনিও দয়া করে একটা ইনসিওরেন্স করান না আমার কাছে?··· দুচোখের উজ্জ্বলতা যেন কাঁচের সীমানা ভেদ করতে চাইলো, 'দৈনিক বসুমতী'তে মোড়া ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র খুলে ধরলেন আমার কাছে।

—আমি, মানে দেখুন আমি ঠিক এখনও ঠিক করিনি। আমি বিব্রত বোধ করি, নোতুন চাকরি। এখনও ঠিক—

—ও আচ্ছা – চোখের উজ্জ্বলতা আবার চশমার কাঁচ-সীমানায় বন্দী হ'লো, কিন্তু তখনও কাঁপছে চোখের পাতাগুলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা আপনার ঠিকানাটা যদি দয়া করে দেন তবে আমিই না হয় একদিন—

– না-না তার দরকার নেই, আমি এড়িয়ে যেতে চাই, দরকার হ'লে নাহয় আমি অসীমবাবুকে বলে জানাবো আপনাকে।

—আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। ধন্যবাদ। ওর দৃষ্টিতে কেমন যেন ম্লানতার ছায়া। কাগজপত্রগুলো আবার সযত্নে মুড়ে রাখলেন উনি।

– মে আই কাম ইন? দরজার কাছ থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। স্যুটপরিহিত একজন ভদ্রলোক। বয়েস উত্তর-চল্লিশ। হাতে পোর্টফোলিও।

—আসুন।

– থ্যাংকস্! ঘরে ঢুকলেন, আচ্ছা অসীমবাবুকে দেখছিনা। উনি কি কোথাও—

—হ্যাঁ, একটু বাইরে গেছেন। বসুন। এক্ষুনি আসবেন।

—থ্যাংকস! বসলেন।

তিনজনেই চুপচাপ। শুধু সদ্য-আগত ভদ্রলোকটি ম্যাক্রোপোলো টোব্যাকো

মিক্সচার বার করে সিগারেট বানাতে শুরু করলেন।··· বানানো শেষ হ'লে ধরা
ফিকে নীলচে ধোঁয়া কেঁপে কেঁপে ভেসে বেড়ালো ঘরের মধ্যে। মিলিয়ে গেল শূন্য
মাঝে।

আমি ফাইলে মনোনিবেশ ক'রবার চেষ্টা ক'রলাম।

প্রথম-আসা ভদ্রলোকটি তাকিয়ে আছেন জানালার বাইরে। যেখানে এ
সজনে গাছ এবং কিছু ক্লান্ত কাকের জটলা।···পাশের বাড়ীর ছাতের কার্নিস
ঝুলছে একটা রঙীন শাড়ী। এবং তারপর আকাশ। উঁচু আকাশ। সবটা
চোখে পড়ে শুধু নীল আকাশের একটুকরো।···

বোধহয় এখন তিনটে বাজে। হয়তো বা বেশী। বা কম।

—আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী পরে-আসা ভদ্রলোকটি শুরু ক'রলেন অ্যাস
সিগারেটটি গুজতে-গুজতে; এ পাড়ারই একটা ফ্ল্যাটে আছি। ব্যাচিলর মা
স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে একটা রিসার্চ করছি। ছাপোষা মানুষ, সাতেও
পাঁচেও নেই। তবু···

—অসীমবাবুকে আপনার কি দরকার? ফাইলে চোখ রেখেই প্রশ্ন করি।

—সেকথাই তো বলছি মশাই, আবার শুরু করেন জয়ন্ত চৌধুরী, ছা
মানুষ তবু রোজ-রোজ রাতে যত ঝামেলা মানে উপদ্রব।

—চোর-টোর নাকি? প্রথম আসা লোকটি একটু যেন অবাক হন।
রাতেই আসে বুঝি? কি-কি চুরি গ্যাছে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

—না-না চোরটোর কিছু নয়। যতসব পাড়ার লোফার ছেলেদের ক
রোজ, মানে রোজ সন্ধ্যে থেকে শুরু হয় ইটপাটকেল, ভাঙা সিমেন্টের টুকরো
যা-তা জিনিস ছোঁড়া।···গতকাল তো—

—ইট-পাটকেল!! বলেন কি মশাই! কেমন যেন চমক-চমক ভাব
ইনসিওরেন্সের এজেন্টটির কণ্ঠে, ভূত-টুত নয় তো? গাঁয়ের বাড়ীতে একবার—

—থামুন তো মশাই! ধমক দেন জয়ন্ত চৌধুরী, ভূত! হুঃ! আমি
রিসার্চ করি, বিদেশে কাটিয়েছি ছ'বছর, আমি বিশ্বাস করবো এ ভূতুড়ে ব্যাপা
সব, স-ব ঐ পাড়ার রক-ফেলার্সদের কাজ। থামলেন একটু, আমিও দেখে নে
এসব আমি মোটেই পছন্দ করিনা মশাই।···আর, আর এসব ভাববার আমার স
বা কোথায়? পাড়ায় কারো সাথে মিশিনা। মিশবার প্রয়োজনও বোধ করি
আমার ক্লাব আছে, পার্টি আছে, সোস্যাইটি আছে, একটু যেন গর্ববোধ ক
জয়ন্ত চৌধুরী, একটু থামেন, মাঝে মাঝে মনে হয় বন্দুকটা বের করে ফ্যায়ার
দিই যেদিকে খুশি। দু'একটা মরে মরুক, ফাঁসির বেশী তো আর কিছু হবেনা।
ব'লে দিনদিন এই আত্মঅপমান। উঃ, অসম্ভব! ইনটলারেব্‌ল!—

—সত্যিই তো, সত্যিই তো। একি অন্যায়, সমবেদনা দেখান লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্টটি, একি অসভ্যতা! অবশ্য যদি ভূতুড়ে ব্যাপার না হয়। বিশ্বাস করুন, সত্যি, আমাদের গাঁ'য়ের বাড়ীতে একবার—,

—আমার বই, মানে আমার লেখা বইতেও আমি একথাই লিখেছি আত্মপ্রচারে জয়ন্ত চৌধুরী ভূতুড়ে ব্যাপার চাপতে চাইলেন, লিখেছি যে মানুষ তো দূরের কথা একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পর্যন্ত মরবার আগে শেষ চেষ্টা করে প্রতিকার করবার জন্য, বাঁচবার জন্য। তাই ভাবছি, আমিও ভাবছি— কেমন যেন নাটকীয়তার সুর জয়ন্ত চৌধুরীর কণ্ঠে।

—না-না মশাই, যাই করুন, ঐ হুটহাট করে যেদিকে খুশি গুলি করে বসবেন না যেন। বলা যায়না তো কে মরতে কে মরে তাছাড়া আইনকে নিজের হাতে—

আলোচনায় বাধা পড়লো। অসীমবাবু ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারে বসলেন।

—কি দরকার বলুন? ড্রয়ার খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন অসীমবাবু প্রথম-আসা ভদ্রলোকটিকে।

—দরকার?···মানে আমি এসেছিলাম, মানে আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো স্যার? ওর চোখের উজ্জ্বলতা যেন আবার কাঁচের সীমানা পার হোতে চাইলো। চোখের পাতাগুলোর কম্পন আরো দ্রুততর হ'লো।

—আ-প-নাকে— আস্তে আস্তে সিগারেট ধরালেন অসীমবাবু, তাকালেন ভুরু কুঁচকে, তারপর ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন কৈ না তো, আপনাকে তো ঠিক মনে করতে পারছিনা।

সে কি স্যার! ওর গলাটা একটু কেঁপে উঠলো চিনতে পারলেন না আমাকে? একটু, একটু মনে করে দেখুন তো ভালভাবে। অধীর আগ্রহে ওর চোখের পাতাগুলো কাঁপছে দ্রুতভাবে।

—উঁহু, ঠিক মনে পড়ছে না তো সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন অ্যাসট্রেতে,

হবে হয়তো, তবু ঠি-ক। থামলেন অসীমবাবু।

—না-না স্যার মনে আপনার ঠিকই পড়বে, ওর গলায় যেন প্রতিশ্রুতির সুর, কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা সেই আমাদের পাড়ায় রবিবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন একটা তদন্ত করতে। সেখানেই, মানে রবিবাবুর বাড়ীতেই আলাপ হোয়েছিলো আমার সঙ্গে, ভবতারণবাবু, আমার নাম; একটু মনে করুন স্যার। সেই আপনার সাথে বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এলাম আমি, সেখানেই আপনার ভ্যানটা ছিলো, আপনি আমাকে···, দেখুন তো স্যার এবার একটু মনে করে, ভবতারণবাবু, ভবতারণ সান্যাল, আমার নাম,' বড়, বড় করুণ এবং বেদনার্ত শোনালো ওর আর্তি।

—রবিবাবু! ভ-ব-তারণ সান্যাল।…উঁহু, এখনো ঠিক মনে ক'রতে প নাতো।…আচ্ছা ঠিক আছে। যাকগে সে কথা, কি দরকার বলুন তো?

—যাকগে সে কথা!! কথাটা যেন আমাকেও কেমন আঘাত ক ছোট্ট একটি কথা। তবু যেন বড় তীক্ষ্ণ। ভবতারণবাবুর সমস্ত আশা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো শুধু ঐ ছোট্ট কথাটির আঘাতে। পরি রূপালী বালুচরে ছোট্ট যে আশার নীড়টি অন্তরের পরম মমতা দিয়ে গড়ে তুলে একটু একটু করে—এই ছোট্ট কথাটিই যেন তাকে ভেঙে গুড়িয়ে মিশিয়ে বিস্তীর্ণ বালুচরে। রূপালী নয়, ঠিক তখনই মনে হ'ল রূপালী নয় বিস্তীর্ণ বা —ধু-ধু এবং ধূসর।…

—আমি মানে আমি, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত শোনালো ভবতারণ বাবুর ক বড় বিপদে পড়ে এসেছিলাম আপনার কাছে, আমি লাইফ ইনসিওরেন্সের এ যদি দয়া করে আপনি একটা ইনসিওরেন্স করান আমার কাছে, তবে, তবে উপকৃত হবো একটু থামলেন, ··আর যদি একটু এখানকার সকলের পরিচয় করিয়ে দেন তবে···

—আর বলেন কেন মশাই? অসীমবাবুর কণ্ঠে বাধা পড়লো করুণ ি মাঝপথে, প্রমোশন হ'ল অথচ সুবিধে হ'লনা কিছুই। আর তাছাড়া অ ইনসিওরেন্সেরই প্রিমিয়ামই বাকি পড়ে আছে তা আবার নোতুন একটা আর পরিচয়? পরিচয় আর কি করিয়ে দেবো? যাননা, আপনি নিজে ি বলুন। থামলেন একটু, খোলা ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র বের করলেন, অ আসুন, বড় ব্যস্ত, নমস্কার!

'দৈনিক বসুমতীতে' মোড়া কাগজপত্রগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল ভবতারণ সান্ সকলকে নমস্কার করেন তারপর ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে বেরিয়ে যান। চোখে পুরোনো দৈনিক বসুমতিটির প্রথম পৃষ্ঠার একটি খবর ,অনাহারে স্বর্ণ জীবনাবসান।…

আমিও বের হয়ে এলাম। বারান্দায়। দেখলাম কোঁচার খুঁট দিয়ে চ ময়লা কাচটা মুছলেন মুখ মুছলেন, ভবতারণ সান্যাল তারপর ধীর পদক্ষেপে এ চললেন। মুখ না চোখ, মুখের ক্লান্তি না চোখের জল, কি মুছলেন। ঠিক ব গেলনা।

—শুনুন আমার ডাকে ফিরে তাকালেন ভবতারণবাবু। এগিয়ে এলেন পা'য়ে।

—সত্যিই আমি দুঃখিত অপরাধীর স্বর আমার কণ্ঠে, এতক্ষণ আপন আটকে রাখলাম তবু কিছুই—

—না-না আপনার কি দোষ? অনেক কষ্ঠে কান্নার চাইতেও অনেক করুণ করে একটু হাসলেন ভবতারণ সান্যাল সবই আমার ভাগ্য, আমার অদৃষ্ট। নাহ'লে হঠাৎ গোল্ড কনট্রোলই বা শুরু হবে কেন?···সবই আমার ভাগ্য। একটু থামলেন, আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি, শুধু-শুধু যাতায়াতের পয়সাটা। ···বাড়ীতে রুগ্না স্ত্রী, অসহায় ছেলেমেয়ে।···আমি, আমি ওদের বাবা অথচ দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবার মতো সামর্থ আমার নেই।···কী-যে হবে? কালকে যে কি খাওয়াবো তারও ঠিক নেই। কী যে করবো?···আচ্ছা চলি। না-না আপনার কোন দোষই নেই। আপনি, আপনি কি আর করতে পারেন বলুন?—

ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বললাম, আপনি আমার ঠিকানা চাইছিলেন। এতে লিখে দিয়েছি। আসবেন একদিন। এলে খুব খুশী হবো। আসবেন তো?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই যাবো। আপনি ব'লছেন যখন, যাবো না কেন? নিশ্চয়ই যাবো— আস্তে আস্তে দুটো সিঁড়ি পার হয়ে হাঁটতে শুরু করেন ভবতারণ সান্যাল। এবং সামনের যে জমিটার ওপর একটু আগে দুপুরের শেষ উজ্জ্বল রোদ্দুরটুকু তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে মরেছে—তার ওপর দিয়ে শববাহকের মত শান্ত, বিষণ্ণ পা' ফেলে ফেলে হেঁটে গেলেন ভবতারণ সান্যাল। একটি স্বপ্নভ্রষ্ট মানুষ!

—আপনি আমায় চিনতে পারছেন না মিস্টার চৌধুরী? ঘর থেকে ভেসে এলো অসীমবাবুর কণ্ঠস্বর সেই মিতালী সংঘের ফাংশানে আপনার সাথে আলাপ হয়েছিলো? মনে পড়ছে না আপনার?

—একস্‌কিউজ মি ঠিক মনে ক'রতে পারছিনা। বোঝেনই তো নিত্য নোতুন পার্টি, ফাংশান কত লোকের সাথে আলাপ হচ্ছে।···যাক, জয়ন্ত চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, যাক একটা ডাইরী করতে হবে, ডিটেলস্ এতে লেখা আছে পোর্টফোলিও থেকে একটা কাগজ বের ক'রে দেন অসীমবাবুকে। তারপর দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন, ন' মিনিট স্লো আছে, আপনাদের ঘড়িটা, বললেন জয়ন্ত চৌধুরী, আচ্ছা চলি, গুড বাই।

দ্রুত পদক্ষেপে বারান্দা পার হলেন জয়ন্ত চৌধুরী।

রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়লো আমার।

রাস্তার ধার থেকে সিদ্ধ ছোলা-মটর-পেঁয়াজকুচি কিনছেন ভবতারণ সান্যাল।

ট্রাম এলো। লোক নামলো দু'একজন। শেষ দুপুরের ট্রাম। ভিড় কম।

ভবতারণবাবু যাচ্ছেন। তখনও। অধীর, আদিম ক্ষুধায়।

টিং-টিং। ট্রাম ছাড়বার ঘণ্টা বাজলো।

ট্রাম ছাড়লো।

তখনও থাচ্ছেন ভবতারণবাবু।

ট্রাম চলছে।

ছোলাগুলো নিঃশেষ করে দেখলেন একবার পাতাটা। শেষবারের মতো ফেলে দিলেন। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখে লেগে থাকা নুনটা ঝাড়লেন।···তা ছুটতে ছুটতে চলন্ত ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে লাফ দিয়ে উঠলেন ভবতারণ সান্যাল।

কোর্টইয়ার্ডে রাখা গাড়ীটা স্টার্ট দিলেন জয়ন্ত চৌধুরী।

ট্রাম চলছে মন্থর গতিতে।

শেষ দুপুরের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে জয়ন্ত চৌধুরীর গাড়িটা

এবং দেখলাম, কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই জয়ন্ত চৌধুরীর তীব্রবেগ গাড়ীটা মন্থর ট্রামটাকে হারিয়ে দিয়ে, বোকা বানিয়ে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল।

বেহাগ

শ্রীকুণাল চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসেছিলাম। রাত্রি থেকে শরীরটা খারাপ লাগছে, সমানভ একটানা ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টির বিরাম নেই। তাই অফিসেও যাইনি।

দরজার বাইরে কলিং বেলটা রয়েছে—কিন্তু তার তোয়াক্কা না করেই বা থেকে দেবেশদা চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'কি হে, ব্যাচিলর, বাড়ী আছ?'

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেবেশদাকে ডাকলাম,—সদলবলে দেবে ঢুকলেন।

'কি, অফিস যাওনি কেন?'

বললাম—'শরীরটা ভাল লাগছিল না দেবেশদা।'

ওপাশ থেকে মণ্টু গুপ্ত ফোড়ন কাটল, 'শরীর নয় দেবেশদা, মনটা খা লাগছিল।'

অনুসন্ধিৎসু চোখে চারপাশটা দেখে ভবেশ বিশ্বাস প্রশ্ন করল, মেঘদূতম্-টা কোথায় রাখলে ব্যাচিলার।

দেবেশদা রক্ষা করলেন। 'ভবেশ, মেঘদূতম্ খারাপ হয়ে যাওয়া মনকে আরও খারাপ করে দেয়, তার চেয়ে বিশু বরং একটু মন খারাপ ও শরীর খারাপের দাওয়াই ও মর্ত্যলোকের অমৃত চায়ের ব্যবস্থা করুক।'

সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডেকে 'চা ও টা'য়ের ফরমাশ জানিয়ে এসে বসলাম।

—তারপর বিশ্বনাথ, তোমার এই শরীরটা প্রায়ই দেখছি খারাপ হচ্ছে, কি বল।

পরবর্তী কথার গতি আন্দাজ করে বললাম 'কিন্তু তা বলে মিস্ত্রীর দরকার হয় না, দেখেছেন তো।'

—বাপুহে, তোমার আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না, সকলে যাদের মা লক্ষ্মী বলে, তাদের ওপর তুমি এত চটা কেন?

—কেন দেবেশদা, কারণটা অনেকবার বলেছি। অমরের ভাগ্যটা দেখলেন তো।

—আমার মনে হয় বিশ্বনাথের 'তিনি' এখনও বোধহয় নদীতে প্রদীপ ভাসিয়ে সৌভাগ্য গণনা করছেন। একটা ব্যর্থ প্রেম দেখে তা দিয়ে প্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যেও না বিশ্বনাথ। মণ্ট গুপ্ত হঠাৎ দার্শনিক উক্তি করে বসল।

এরকম দার্শনিক উক্তির জবাব নিজের কথায় দেওয়া যায় না,—বেদ-পুরাণকে ধরে টান মারতে হয়। বললাম, 'মণ্ট, তোমার তো একটু-আধটু সংস্কৃত চর্চ্চার অভ্যেস আছে, ঋগ্বেদ পড়েছ?'

—না, কিন্তু কেন?

—পড়লে আরও একটা কথা জানতে। উর্বশী পুরূরবাকে কি বলেছেন জান?

—বল, কি বলেছেন।

—বলেছেন 'পুরূরবা, ন বৈ স্ত্রীনানি সখ্যানি সন্তি, সালাবৃকানাং হৃদয়ানি এতা,'—অর্থাৎ, হে পুরূরবা, মেয়েদের সঙ্গে সখ্য হয় না—তাদের হৃদয় শেলবাঘার মত নিষ্ঠুর।

—দেবেশদা এতক্ষণে মুখ খুললেন, কোথাকার আর কবেকার কথা আর অমরের ব্যর্থ প্রেম তোমার মাথাটাকে খারাপ করে দিয়েছে। আমি এমন একটা কাহিনীর সাক্ষী যেটা তোমার এই ভুল ধারণাটাকে নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট।

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ দেবেশদার দিকে ফিরল।

দেবেশদা বললেন, 'দাঁড়াও আগে চা আসুক, তারপর জমিয়ে বসে গল্পটা শুরু করা যাবে।'

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবেশদা শুরু করলেন, 'আমি যখন এম. এসসি ক্লাশের ছাত্র, তখন আমার সহপাঠী একজনের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। সমর রায় ছিল একেবারে ফাইন জেন্টলম্যান। ফর্সা রোগা, লম্বা—নামে সমর হলেও, কারো

সঙ্গে জোরে কথা পর্যন্ত বলত না। ক্লাশে এক মনে অধ্যাপকদের লেকচার শু
খবর পেয়েছিলাম ছেলেটি ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু তা' হ'লেও অমন লাজুক আর গ
প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে কেউ বন্ধুত্ব করতে চাইত না।

অনেকটা করুণাপরবশ হয়েই একদিন ওর সঙ্গে আলাপ করলাম। ে
অবাক হ'লাম কি করে ঐ আপাতগম্ভীর চেহারার তলায় অত নরম একটা ম
ও লুকিয়ে রাখতে পেরেছে। দু'বছর আমরা পরস্পরের নিবিড় সাহচর্য পেয়েছি
বলতে গেলে সমরের দৌলতেই এম. এসসিতে আমার অত ভাল রেজাল্ট হয়েছিল

সমর অনেকবার আমাদের বাড়ী এসেছে। ওর মধুর স্বভাবের গুণে আমা
বাড়ীর সকলের ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। আমি অনেকবার বলেছি, 'স
তোদের বাড়ীতে আমাকে একদিনও নিয়ে গেলি না।'

ম্লান হেসে জবাব দিত, 'যার মা বাবা নেই, তার বাড়ীও নেই, বুঝলি দেবেশ

শুনেছিলাম সমরের শৈশবাবস্থায় ওর মা মারা যান, ওর কৈশোরে ওর বা
পরলোক গমন করেন। তবুও বলতাম, 'তবুও তুই কোথাও একটা থাকিস তো

—পরে নিয়ে যাব দেবেশ, আজ না।

তারপর হঠাৎ কোন কাজের অছিলা করে ও উঠে যেত। আমি বুঝতা
পালাতে চাইছে।

ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে একটু একটু ক'রে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেতে শুরু করল
অবশ্য এ বিষয়ে সমর কিছুই জানত না। মাঝে মাঝে কফি হাউসের
ইণ্টেলেকচুয়ালদের সঙ্গে তর্কের ঝড় উঠত, কখনও বা পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোঁ
ক্যাবারে দেখতে যেতাম। বাড়ীতে অজুহাতের অভাব হোত না, সমরের
পড়ছিলাম বললেই সাতখুন মাপ। তবে একটা কথা, আমার ভূমিকা ছিল নি
দর্শকের। অসংযত হওয়ার মত মনোবল বা অর্থবল আমার ছিল না।

ক্রমে ক্রমে সোসাইটি গার্লদের সঙ্গে একটু একটু জানাশোনা হ'তে লাগ
দু' একজনের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতাও।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছিল রত্না রায়। ব্যারিস্টার প্রশ
চৌধুরীর একমাত্র কন্যা।

তোমাদের তার বর্ণনা কি দেব। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা নারীরূপের বর্
করতে যে সমস্ত উপমার প্রয়োগ করেছিলেন, তা'র অধিকাংশই তার প্রতি প্রযোজ
তবে তফাৎও ছিল,—মুখে লোধ্ররেণুর পরিবর্তে কড়া পেণ্ট আর হাতে নীলাপ
বদলে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ।

রত্না রায় বিবাহিতা, কিন্তু সীমন্তিনী নন। এরকম প্রগলভা ও উদ্দামযৌব
নারী খুব কমই চোখে পড়েছে। তার বক্রকটাক্ষ আমাদের তরুণ রক্তে আ

ধরিয়ে দিত। কত অলস মধ্যাহ্নে রত্নার কথা ভেবেছি, সেই সঙ্গে তার ভাগ্যহত স্বামীর কথাও।

এম. এস-সিতে সমর ফার্স্টক্লাশ পেল, আমিও মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করলাম।

দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে চলেছি, হঠাৎ বললাম, 'সমর, চল তোর ওখানে যাই। আজ আর কোন কথা শুনব না।'

সমর গম্ভীর হয়ে গেল, তারপর হঠাৎ উদাস হয়ে গিয়ে বলল, 'যাবিই? তাহ'লে চল।'

লি রোডের যে বাড়ীটার সামনে এসে সমর দাঁড়াল সেটা আমার ভালরকম চেনা।

—সমর এটা তো ব্যারিস্টার প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়ী!

—হ্যাঁ এখানেই আমি থাকি।

—রত্না, রত্না রায়কে চিনিস।

—ও আমার স্ত্রী।

চোখের সামনে ভূত দেখলেও বোধহয় এতটা চমকাতাম না।

—প্রশান্ত চৌধুরী তোর কে হন?

সমর হাসল। 'আমার পিতৃবন্ধু। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমাকে ওঁর হাতে দিয়ে যান। তারপর আমার মেধা ও স্বভাব এত বেশী করে ওঁকে আকর্ষণ করে যে আমাকে চিরকালের জন্য বাঁধতে চাইলেন,—আমার না বলার শক্তি ছিল না কারণ আমিও তখন মোহমুগ্ধ। আর কিছু প্রশ্ন করিস না দেবেশ।'

আমার আর বাড়ীতে ঢোকা হ'ল না। সমরের গাম্ভীর্য আর নিরানন্দ স্বভাবের কারণ তখন আমার কাছে স্পষ্ট। রত্না রায়ের সেই ভাগ্যহত স্বামী আমারই একান্ত বন্ধু সমর! আমার চোখ সজল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ চাকুরী পেয়ে গেলাম ভাল একটা। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী। কাজটা ঘোরাঘুরির,—প্রথম আমায় যেতে হ'ল দিল্লী। সমরকে জানাব জানাব মনে করেও ওর কাছে যেতে পারলাম না। শুনেছিলাম ও রিসার্চ করছে।

এর বছর দেড়েক বাদে হঠাৎ একদিন কাগজে ব্যারিস্টার চৌধুরীর মৃত্যুসংবাদ জানতে পারলাম।

দেবেশদা থামলেন। তিন জনে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর দেবেশদা?'

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার দেবেশদা শুরু করলেন, 'আমি তখন মীরাটে গিয়েছি কি একটা কাজের জন্য। সন্ধ্যাবেলায় বাজারে হঠাৎ দেখলাম সমরকে। ডাকলাম নাম ধরে। ও আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল।'

—দেবেশ তুই। কতদিন পরে দেখা।

—আমি তোমাকে এরকম করে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না। তোমাকে এসব ছাড়তে হবে।

—হুকুম নাকি!

ওর ব্যঙ্গভরা স্বর শুনে নিজেকে ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'হ্যাঁ হুকুম এবং তোমাকে তা মানতে হবে।'

অর্ধজড়িত কণ্ঠে উচ্চহাস্য করে চেপে চেপে বলল, 'ঘর-জামাই-এর আবার হুকুম!'

আর শুনতে পারিনি—কানে হাত চেপে পালিয়ে এলাম। ওর কণ্ঠের জড়ানো হাসি আমাকে তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল।

সেই রাত্রেই বাড়ী ছাড়লাম। সামান্য পোশাক ও কিছু টাকা নিয়ে এসে উঠলাম একটা হোটেলে।

এর আগের দিন মীরাটের এই চাকরিটার কথা কাগজে পড়েছিলাম। তাই পরদিন সোজা গিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। ভাগ্য ভাল ছিল, সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা হয়ে গেল। তারপর থেকেই আমি মীরাটবাসী।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনে বসেছিলাম। আসার সময় সমর বলল, 'দেবেশ, আমি কি ভুল করেছি?'

আমি বলেছিলাম, 'জানি না সমর, তবে আমি হলেও এই করতাম।'

মীরাট থেকে ফিরে আমাকে অফিসের কাজে রেঙ্গুন যেতে হ'ল। সমরকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম উত্তর পাইনি।

এরপর বছর পাঁচেক কেটে গেছে। বোম্বাই গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কি খেয়াল হ'ল—চলে গেলাম কন্যাকুমারী।

দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছি এমন সময় চোখ দুটো আটকে গেল।

রত্না না। হ্যাঁ রত্নাই। বছর তিনেকের একটি ছেলের হাতধরে একদৃষ্টে দেবীমূর্তির দিকে চেয়ে। কিন্তু একি সেই উগ্র আধুনিকা রত্না? শাদা পাড়বিহীন কাপড়, রুক্ষচুল আর ম্লান চোখ!

আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে বললাম, 'মাপ করবেন, আপনার নাম রত্না রায়।'

ও চমকে আমার দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—'দেবেশবাবু!'

—আপনাকে এ অবস্থায় এখানে দেখব কখনও ভাবিনি। কোথায় উঠেছেন?

—ধর্মশালায়।

ওর সংক্ষিপ্ত উত্তরে চমকে উঠলাম।

রত্না রায় উঠেছেন ধর্মশালায়! ঠিক শুনছি তো!

বললাম, 'চলুন আপনাকে পৌঁছে দি।'

একটানা অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেল ও। বললাম, 'দাঁড়া একটু কা
সেরে নিই, তারপর তোর সব কথার জবাব দেব।'

—দেবেশ, একদিন তোকে আমার বাড়ী দেখাতে পারিনি,—আজ চল আ
কোয়ার্টার্সে।

ওর সঙ্গে ওর কোয়ার্টার্সে গেলাম। চাবি খুলে ভেতরে ঢুকলো সমর। এত
ভাবছিলাম রত্নার সেই প্রথম জীবনের উদ্দামতা বোধহয় এতদিনে কেটে গেছে
ওরা বোধহয় কপোত-কপোতীর মত কলকাতা থেকে বহুদূরে এসে নিজেদের ম
নিজেরা ডুবে আছে।

নির্জন কোয়ার্টার্স থেকে প্রথম ধাক্কা খেলাম।

—কিরে সমর, মিসেস কি বেড়াতে গেছেন ?

সমর কোন উত্তর দিল না। বাইরে দু'টো চেয়ার টেনে এনে দু'জনে বসল
প্রশ্ন করলাম—'সমর, তোর ফার্স্ট ক্লাস মাস্টার্স ডিগ্রী—ডক্টরেটও নিশ্চয় পেয়ে
—তবুও কলকাতা বা কাছাকাছি কিছু হ'ল না।'

—না, রে, হঠাৎ মীরাটের এই নতুন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীটায় মোটা মাই
ভাল পোস্ট পেয়ে গেলাম—তাই চলে এলাম।'

বুঝলাম ও কিছু চেপে যাচ্ছে। আমার কৌতূহল তখন আমাকে অস্থির ক
তুলেছে। সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'তোর স্ত্রী কোথায়।'

চেয়ারটার হাতলে মাথাটা ঝুঁকিয়ে সমর কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর ব
'শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার খবর বোধহয় জানিস!'

—হ্যাঁ, কাগজে পড়েছিলাম।

—তারপর থেকে রত্নার অসংযম ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে গিয়ে পড়
তুই তো আমাকে জানিস—কারুর সঙ্গে জোরে কথা বলতে পারি না, চির
পরের দয়ায় মানুষ, কিন্তু একদিন আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

রাত্রি বারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, রত্না তখনও ফেরেনি। আমি ভাবছি
আমার শ্বশুরমশাই-এর অবর্তমানে রত্নাকে রক্ষা করার দায়িত্ব অনেকটা আ
ওপর। হঠাৎ সিঁড়ির ওপর অর্ধজড়িত কণ্ঠস্বর শুনে চমক ভাঙল। রত্না ফি
কিন্তু গলার স্বর অমন কেন। আর ভাবতে পারলাম না।

সোজা গিয়ে সামনা সামনি দাঁড়ালাম।

—রত্না দাঁড়াও।

থমকে দাঁড়াল ও—ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কেন ?'

—তুমি মদ খেয়েছ ?

—হ্যাঁ, বেশ করেছি।

ওর ঘরের কাছাকাছি এসে বললাম, 'সমর কোথায় ?'

হঠাৎ রত্না কেঁদে উঠল। বলল, 'চলুন, আপনাকে সব বলব—আমি আর নে রাখতে পারছি না।'

ওর ঘরে বসলাম।

পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। রত্না বলে চলল, 'ও চলে যাবার পর আমার সাম বাধাটাও দূর হ'ল। চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ডুবে গেলাম।'

আজ ভাবি, কেন সেদিন ও অমন করে চলে গেল। আমার ওপর যে করে কেন ও নিজের অধিকার চাপাল না ? তারপর নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে একদিন চরম আঘাত পেলাম। তখন বড় বেশী করে সমরের কথা মনে হয়েছিল

পরদিন সোজা মীরাটের টিকিট কেটে সমরের কোয়ার্টার্সে গিয়ে হাজির হল ও আমাকে দেখে স্তম্ভিত হ'ল। সব বললাম, প্রশ্ন করলাম—'আমাকে ক করবে ?'

আস্তে আস্তে আমার সামনে এসে বলল, 'আমি তোমাকে পেলাম, এর বড় পাওয়া আমার আর কিছু নেই রত্না।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু সমর এখন কোথায় রত্না দেবী ?'

খুব আস্তে আস্তে জবাব পেলাম, 'উনি দেড় বছর আগে কেমিক্যাল এক্সপেরি করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে মারা গেছেন।'

—কিন্তু, আপনি ? আপনি এরকম হয়ে গেছেন কেন ?

রত্না রায় জবাব দিলেন, 'প্রতি তীর্থে যাই আর বলি, পরজন্মে যেন পাই।'

দেবেশদা চুপ করলেন।

আমি বললাম, 'কিন্তু দেবেশদা, সমরের ট্রাজেডিটা ভুলছেন কেন ?'

দেবেশদা উত্তর দিলেন, 'না বিশ্বনাথ, এটা ট্রাজেডি নয়। ওদের আত্মিক হয়েছিল। পরিবেশ মানুষকে বিপথগামী করলেও সহজাত প্রবৃত্তি তা শুধরে দে

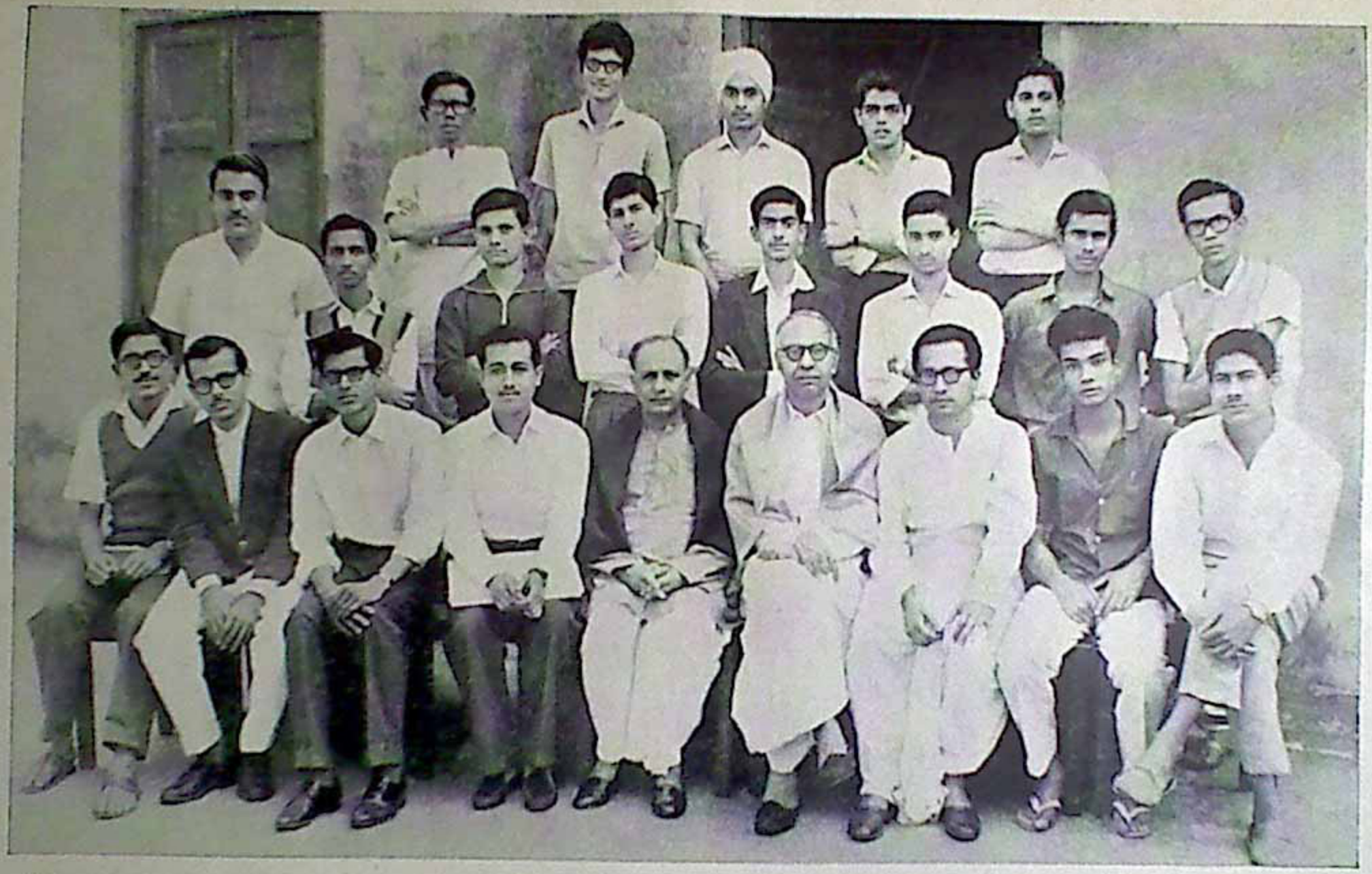

Sitting on the Chair (L to R)—T. Banerjee, Vice-President ; S. Bhattacharjee, Cultural Secretary ; B Ganguli, General Secretary, Prof. S. Das, President, Vice-Principal N K. Bhattacharya ; Principal K. N. Sen ; Prof. S. Ganguli, Prof-in-charge of Common-room , T. Bose, Asst General Secy ; A. K. Sinha, Common room Secretary ;

[illegible]

বসে (বাম দিক থেকে)—কাশীনাথ প্রামাণিক ; সোমেন ঘোষ (যুগ্ম-সম্পাদক, রবীন্দ্র পাঠচক্র) ; সত্যব্রত সান্যাল (সহ-সভাপতি, রবীন্দ্র পাঠচক্র) ; বরুণ গাঙ্গুলী (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-সংসদ) ; অধ্যক্ষ শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন ; উপাধ্যক্ষ শ্রীনীরোদকুমার ভট্টাচার্য ; অধ্যাপক শ্রী[illegible] (সভাপতি, রবীন্দ্র পাঠচক্র) ; অধ্যাপক শ্রী[illegible]

তোমার ডাক

শ্রীসুশীলকুমার বশিষ্ঠ
প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

মাঠের ধূলায় তোমার খেলায় ডাকলে মোরে প্রিয়
ধূলার ভারে মাথা আমার পূর্ণ করে দিও।
গভীর বনের গহন তলে
দূরের দীঘির কালো জলে
ফোটা ফুলে তোলে যেমন কমল কোমল করে
এবার আমায় লহ তুলে তোমার খেলার তরে।

কোন মাঠেতে খেল তুমি ছিল না তা জানা
তোমার কাছে আসতে এবার আর কোরো না মানা।
এবার আমি দুহাত ভরি
বনে বনে দিবস ঘুরি'
তোমার মত কুসুম তুলি' ভরব আমার সাজি।
হৃদয় তলে চোখের জলে হোকনা খেলা আজি।

উষাকালে শুকতারাটি উঠে মাথার পরে।
তোমার প্রেমের স্বর্গ-সুধা আমার দেহে ঝরে।
মনের ধূলা ধুয়ে ফেলি
তোমার পানে আঁখি মেলি ;
তোমারি ডাক সুদূর হতে আলোর ধারা মাঝে
আমায় ডাকে তোমার মাঠে দিনের শেষে সাঁঝে।

সূর্য করে চন্দ্র যেমন হল সুধাকর
তোমার আলোয় আমায় কর বিশ্ব মনোহর।

দিনে রাতে তোমায় আমায়
প্রখর করে গাছের ছায়ায়
কালো মেঘে শশী যেমন ডুবে ওঠে ভেসে
জনম মরণ খেলব আমি তারার মত হেসে।

বরষ সন্ধ্যা

শ্রীজয়দেব দাস
প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

আকাশের কোলে মেঘ ভেসে চলে
মনে হয় ভাসে তরণী,
চারিদিক ঘিরে আসে মেঘ করে
আঁধারিয়া আসে ধরণী।
ঝুম্ ঝুম্ নূপুর ছন্দে
ঝরে বরষার ধারা
ফুলবনে আজ ফুলগুলি সব
দুলে দুলে হ'ল সারা।
ঝরা পাতা বনে ঝরিছে বরষা
ঝিনিকি ঝিনিকি ছন্দে,
পূরবী পবন ভরিছে সুবাসে
কদম কেতকী গন্ধে
রজনীগন্ধা ফোটেনি এখনো
সন্ধ্যা আসেনি বঙ্গে
বেলা শেষে আলো, ছায়া মায়া ছবি
দুলিছে প্রকৃতি অঙ্গে,

সম্ভাব্য সাক্ষাতে

আঁধার গগনে ডুবিবে গোপনে
নয়ন অলখে রবি,
ফুটিবে আঁধারে বরষা মাঝারে
সন্ধ্যা প্রিয়ার ছবি।

সম্ভাব্য সাক্ষাতে

শ্রীযোগব্রত চক্রবর্তী
তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

হঠাৎ দেখলাম···
অনাবাদী জমির মত, সিঁথি তোমার এখনও অক্ষত।
দশবছর পরে হলেও···
তুমি সময়কে শাসনে রেখেছ প্রচুর।···
ভয় হ'ল···
তোমার সেই হাসি, এবং তৎসহ প্রশ্ন ;
"কেমন আছ ?"
যা শুনলে মনে হবে
তোমার মনে এই দশ বছর···আমারই চলেছে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।··
কিন্তু দোহাই তোমায়···
এখন আমাকে দেখে···সেই পরিচিত প্রহসনটা আর কোরোনা···
এই দশ বছরের ব্যবধানে···আমি অনেক পালটেছি
সংসারী হয়েছি···অভিজ্ঞতায় নিরেট হয়েছে
আমার পুরোন মনটা।···
দশটা···আটটার ডেলিপ্যাসেঞ্জারের
প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী করে ফিরছি,

হাতে কালকের রসদ···
অসময়ের তিনটে ফুলকপি···।

তাই তোমায় শেষ অনুরোধ
জনারণ্যে আমায় তুমি চিনেও চিনোনা।

আমি

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ : বিজ্ঞান

উড়ে যাই পাখা মেলে সবুজ দিগন্ত পারে,
মিশে যাই পাতাদের আলোতে ছায়াতে,
ডুবে যাই প্রকৃতির নীলাম্বুরাশিতে,
ফেলে যাই স্মৃতিগুলো অলিতে গলিতে ॥
অচেতন কোন এক বাদামী ইচ্ছায়
সতর্কিত হৃদয়ের অশরীরী চিন্তায়
মনমাঝির আকাশে অহেতুক ভিড় তাই—
শুধু যে কল্পনা কখনও স্থির নাই ॥

ভাবনারা কেন আসে অতীতের তরী বেয়ে
তাহাদের অণুদের আহ্বান করি গিয়ে
নিরিবিলি অবসরে অনিমেষ পরিচয়ে
সময়ের অগোচরে শৈশবে পাড়ি দিয়ে ॥

আদপেই ছিল তার অমলিন ধূসরতা
আনকোরা চেতনার অকুশল মধুরতা

সবুজিমা প্রকৃতির মানসিক কোমলতা
বাকী ছিল বলা তবু হৃদয়ের কিছু কথা ॥

দ্রুত লয়ে বেজে চলে ভাবনার কিঙ্কিনি
বিস্মিত করি বসে জীবনের বিকিকিনি
আজ শুধু মনে হয় তাহাদের চিনি চিনি
তাই রচি অবসরে কবিতার শিঞ্জিনী ॥

মিনতি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ কাঁড়ার
স্পেশাল অনার্স : অর্থনীতি

অরুণিমা, তুমি আর এসনা—
জৈব-কামনা ব্যাকুল আমার
এই দেহের সংস্পর্শে তুমি আর এসনা।
তোমার আমার মাঝে
অপরিসর এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে,
আরও সংকীর্ণ করে তুলোনা,—
এই আমার একান্ত মিনতি।

বিস্তৃতি-ই যখন জীবনের ধর্ম,
জগৎকে তখন সংকীর্ণ সীমায় বেঁধে
জীবনকে অসম্পূর্ণ হতে দিও না—
আমার এই মিনতি তুমি রাখ, অরুণিমা।

সিন্ধুতীরে দাঁড়িয়ে দেখেছ নিশ্চয়—
দূরে দিকচক্রবালে সমুদ্র ও আকাশের
নীল-নীলিমার কি অদ্ভুত মাখামাখি ;
ভেবে দেখ, ওদের নীলিমাই পরস্পর মিশেছে ;
কিন্তু ওদের মাঝে রয়ে গেছে দুস্তর ব্যবধান।
ঐ ব্যবধান যদি সংকুচিত হ'ত, তা'হলে
আকাশ হারাতো তার নীলিমা,
আর সমুদ্র হারাতো তার সৌন্দর্য ও স্বাদ।

তাই বলি, তুমি আর এস না—
তোমার আমার মাঝে অপরিসর এই পৃথিবীকে
আরও সংকীর্ণ করে তুলো না।
তার চেয়ে এস, তুমি আর আমি
থাকি দূরে দূরে আকাশ ও সিন্ধুর মত।
উত্তাল তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ আমার জীবনে—
তোমার চিত্তাকাশের নীলিমা ঝরে' ঝরে',
সৃষ্টি করুক এই মাটির পৃথিবীতে
এক অজৈব আনন্দ ও সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন।

ডুবুরী

শ্রীগৌরীশঙ্কর

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

এই পৃথিবীতে বন্ধু পাওয়া কি সোজা ?
জমে যায় ঋণ, জমে ওঠে ক'ত বোঝা,
তার চেয়ে সোজা সাগরে মুক্তো খোঁজা।

সব শুক্তিতে মুক্তো তবু কি থাকে ?
ক্বচিৎ কখনো পাওয়া যায় তালে ফাঁকে।
নাই যদি মেলে, কাদা ঘাঁটাটাই সার,
ভাগ্যের দোষ দেবোনা তো বারবার।

আমি তো ডুবুরী, মুক্তো চিনেছি ঠিক্,
হারাই যদি বা, ভাগ্যে দেবো না ধিক্।
শুধু একদিন খুলে বসে বাতায়ন,
সংসার থেকে ছুটি করে নেবো মন।

যাবো চুপিচুপি নীল সাগরের তীরে,
সাগরের নীল আকাশে গিয়েছে ফিরে।
মুক্তোরে কবো, এই তুমি আছো বেশ,
তোমার যোগ্য, এই শান্তির দেশ॥

স্বচ্ছ দৃষ্টি

শ্রীতারককুমার বসু
দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

ধূপ ধুনো গুল্মের গন্ধ নয়
সিগারের উৎকট পরিণতি
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ছবিগুলো যে দেখছ
সেগুলো তোমার মনের বিকার
শেল্‌ফের মধ্যে যে ক্যাপিটালিজিম্
সোসিয়ালিজমের ভিড়
তা তোমার বিলাসী মনের খেয়াল

ভালোবাসা ? প্রেম ? লাভ ?
তোমার কাব্যে
ব্রীড়াময়ী তৃতীয়ার চাঁদ
সমুদ্র-সৈকতে সদ্য-জাত সূর্য
লাস্যময়ী নিসর্গ অনুভূতি
অসীম দেহাতীত-রবীন্দ্র
(সব) অজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদান্ত উদ্ধৃতি।
বিজ্ঞান, শিক্ষা, আধুনিকতা
পণ্ডিত নয়, অধ্যাপক শিষ্যা
প্রগতি, সভ্যতা, দেশপ্রেম
মেকি, ঢক্কা নিনাদ !
গতিহীন প্রগতি
পুলিশ দেখে পকেটমারের গতি
অফিস টাইমের অর্ণবযান।

ভালোবাস।
ভাসিয়ে দাও তার বুক
কান্নায় কান্নায় নয় দীর্ঘশ্বাস
দেশ সেবায় সাহায্য নয় সততা
আধুনিকতায় দেহাবরণ ক্রমহ্রাসমানের প্রতিযোগিতা নয়
হৃদয়ের নগ্নতা।

তবেই
তবেই তুমি পাবে
তবেই তুমি পাবে আকার
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ছবিগুলো থাকবে
দুলবে, চলবে, চালাবে।

দুলবে লোহার পেরেকে নয়
হৃদয়-মজ্জার আংঠাতে। তোমাকে চালাবে
বাস ট্রামের চাকায় নয়—চিন্তায়।
তুমি কাজ করবে
গণতন্ত্রের ফুঁকো বক্তৃতায় নয়
সমাজতন্ত্রের খামারে, কারখানায়, স্কুলে, চিকিৎসাকেন্দ্রে।
তুমি সৃষ্টি করবে
কামনায় অন্ধ হয়ে নয় ভালোবাসার আনন্দে।
তোমার সিগার-মদ-লালসার পয়সা দিয়ে
আসবে ধূপ ধুনো গোলাপ-মালঞ্চ

তবেই
তবেই তুমি পাবে
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মার্কস্, লেনিন্
লিঙ্কন, শেলি রবীন্দ্রনাথকে
তুমি পাবে।

অমৃতের পুত্র

শ্রীপ্রলয় শূর

প্রাক্তন ছাত্র

"কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছি অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই তখনই তিনি সামান্য দস্যুর হ পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় শক্তি সকলের এক জায়গায় ন কোন দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোন দেশ নি সর্বাঙ্গে শক্তি কবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।" ভারতবর্ষের শক্তির উৎস কো কোন দিকে তার ব্যপ্তি তার প্রতিষ্ঠা কিসে, রবীন্দ্রনাথের মানস সন্তান ভারতপ গৌরমোহন একদিন এই অন্বীক্ষায় বেরিয়েছিল। গোরা, প্রচলিত অর্থে য়ুরোপী জন্মসূত্রেও তাই; গভীরতর দ্যোতনায়, "চাঁদের অমিয়াসনে চন্দন বাটিয়া গো, মাজিল গোরার দেহখানি।" যে গোরা ভারতের ধ্যান ধারণায় সমাজভাব বিপ্লব এনেছিলেন তারই উত্তরপুরুষে এসে এই গৌর, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ অমৃত উপলব্ধির বাহক। গোরা উপন্যাসের চরিত্রসংস্থান, ঘটনাধারা ও রসপরি আপাততঃ আমাদের বিচার্য নয়। আমরা শুধু গোরার সত্যানুসন্ধানের উপলব্ধির পর্যায়পরম্পরা লক্ষ্য করব। ভারতবর্ষের হিন্দু তখন বহুধাবিভক্ত—একি মহামহা উপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ, কৃষ্ণদয়ালের হঠযোগ, অবিনাশ, হরিমোহিনীর সং ও আচার, মহিমের আত্মসন্তৃপ্ত চোগা চাপকান সমন্বিত চাকুরে হিন্দুত্ব, অপরি পানুবাবুর ব্রাহ্মতা, বরদাসুন্দরীর আচারদ্বেষী অনাচার ও প্রাজ্ঞ পরেশচন্দ্র। এ সম্পর্কের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গোরা এবং তার সুহৃদ বিনয়ের চরিত্র প্র হচ্ছে।

প্রথম পরিচয়েই গোরা তার মজবুত চোয়াল, চওড়া কবজি, রজতগিরিনিভ অ বজ্রকণ্ঠের মন্দ্রস্বর বা নিনাদস্বনন, নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ও অসংশয় ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকের মননের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দেয়। প্রত্যেককে সে গভীর কিছু তীব্র বলে ধাঁধিয়ে দেয়। তার চিন্তায় সত্যের ছোঁয়া পাওয়া যায় ক্ষণে "নিজের বা পরের কারুর সংগেই তার মিথ্যাচার ছিল না।" কিন্তু তার চরমতম কি সেটা সে নিজেও বলতে পারে না, কেউ সম্পূর্ণ করে কিছু তার কাছে পায়ও এর কারণ সে নিজেই জানে না, ভাবসমুদ্রের অকূল পাথারে সে তার সাধন ভাসিয়েছে। জাহাজের কাপ্তেনের মতো সেও দূরবীক্ষণের সাহায্যে সুদূরতমের দি

লক্ষ্য করে বসে আছে। কূলের অবশ্য দৃষ্টিপথে ইসারা না থাকলে তার অন্তরে যে সত্যান্বেষণের দীপ উজ্জ্বল হয়ে আছে তাই কম্পাসের মতো তার দিক নির্দেশ করে চলেছে। সে প্রত্যয়দৃঢ়—"আমি পথ ভুলতে পারি, ডুবে মরতে পারি। কিন্তু আমার লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে—সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ, ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্মে পূর্ণ। এই পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ।" এই লক্ষ্মীর বন্দরটিতে পৌছোনর জন্য গোরার প্রয়াস ও প্রযত্নে কোথায় যে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে; গোরা কিছুতেই তার সত্যস্বরূপটি ধরতে পারে না। তার সদ্বিৎসা বারে বারে আহত ব্যাহত হতে থাকে। আণ্ডাকুটির ঝাঁকা মাথায় বৃদ্ধ মুসলমানটি চাবুক খেয়েও আল্লার উপর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তার নিষ্ক্রিয়তাকে গোরা উদ্বেজিত করতে পারে না, চরঘোষপুরের কৃষকরা গোরার হাতে পায়ে ধরে তাদের হয়ে প্রতিবাদ করতে নিষেধ জানায়। সে নিজে লছমিয়ার হাতে জল খেতে পারে না; যুক্তি দেখায় তাহলে তার সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে; এবং প্রায় একই যুক্তিতে বিনয়কে দূরে রাখে তার আপাত অনাচারের জন্যে এমনকি তার মা আনন্দময়ীকেই সে এক সময় সামাজিক স্বীকৃতি দিতে নারাজ হয়—গোরার ধর্ম ও সমাজদর্শনের অসঙ্গতি ক্রমশঃ প্রকট হতে থাকে। গোরা যাদেরকে অনুগত সঙ্গী হিসেবে পায় সেই অবিনাশের দল উনিশ শতকের স্পর্শকাতর হিন্দুর প্রতিনিধি যাঁরা তাদের ধর্মের ব্যাখ্যা খোঁজেন মোক্ষমূলার এর বেদের টীকায়, যাঁদের আর্যামি য়ুরোপীয়ের সমর্থন ও প্রশংসার জন্য ব্যাকুল, যারা গোরার 'হিণ্ডুইজম' এর উপর রচিত প্রবন্ধ পড়েও তার আচার পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 'হিন্দুধর্ম প্রদীপ' উপাধি দিতে প্রস্তুত হয়।

তার পরিক্রমা সত্য ভারতবর্ষের যথার্থ পথে হচ্ছে কিনা যখনই এই সংশয়ে সে বিদ্ধ হয় তখন যাদের কাছে সে ছোটে তাদের মধ্যে পরেশবাবু প্রধানতম। পরেশবাবু—পরেশনাথ, যদিও রবীন্দ্রনাথ একবারও বলেননি পরেশনাথ, আমাদের মনেহয় পরেশবাবুর ক্ষমাসুন্দর, স্নেহনিবিড়, ধ্যানপ্রবুদ্ধ সত্তা পরেশনাথের সঙ্গেই তুলনীয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের দাদামশাই ও ধনঞ্জন বৈরাগীর সমগোত্রীয় পরেশবাবু—মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে আছেন যিনি সেই 'এক' এর সাধনা করছেন; তিনি 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ জেনেছেন। অতএব, 'ন বিভেতি কুতশ্চন' কোন কিছু থেকে ভয় পাবার কিছু নেই তাঁর। গোরার প্রতি পরেশবাবুর আহ্বান 'একধেবানুদ্রষ্টব্য মেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্'। গোরার আবাল্যবন্ধু বিনয়কে বলা যায় গোরার মনের আয়না। যখনই যেখানে কোন নোতুন ভাবের উদয় হয়, নোতুন চিন্তার উদ্রেক হয় সে বিনয়ের মধ্যে তাকে প্রতিফলিত করে যাচিয়ে নেয়।

সুচরিতা, যাকে পরেশবাবু কখনও 'রাধারানী' ছাড়া বলেননি—রাধারানী, হ্লাদিনী যা মহাশক্তি, সর্ব্বশক্তি তার প্রতি প্রথম যেদিন গোরার মনযোগ আকৃষ্ট হল

সেদিন, "তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে বাড়ি চলিল।" দ্রুতগতি শুধু চলনের নয়, মননেরও, বাড়ি—যেখানে আ আছেন, তার 'লক্ষ্মীর বন্দর' ধ্যানের ভারতবর্ষ। সে হিমালয়ের নির্জন থেকে উৎসারিত শান্তিবারিবাহিনী গঙ্গার তীরে দাঁড়াল; নিস্তব্ধ প্রকৃতি অবারিত আকাশে কোটি নক্ষত্রের জ্যোতিষ্ক, নদীর উপরে নৌকার মিটিমিটি বা দীপহীন নিস্তব্ধতা এবং পরপারের গাছগুলির নিবিড়ঘন কালিমার ঊর্ধ্বে অন্ধ অন্তর্যামীর মত বৃহস্পতিগ্রহের তিমিরভেদী অনিমেষদৃষ্টি, কোন অপরিচিত ফুলে কোমল গন্ধ নিয়ে গোরাকে একটা অতলস্পর্শ অনাদিশক্তির আকর্ষণে এক অনি লোকে নিয়ে চলল, "যেখানে নীলাকাশের নিচে দিনগুলি যেন কাহার উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনতপল্লবের লজ্জাজড়িত একই কালে আনন্দও বেদনায় তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে উদ্বেল, বিস্রস্ত করে তুলল। হেমন্তের রাত্রে নদীর তীরে নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অ আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আস্ হইয়া দণ্ডায়মান হইল।" তার মনে প্রশ্ন জাগল, তার মনে এই নোতুন উদ্ স্থান কোথায়? সেই আশ্চর্য সন্ধ্যায় কবির মত গোরারও মনে ঝংকৃত হল।

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে
অমল কমলমাঝে জ্যোৎস্না রজনী মাঝে
কাজলঘন মাঝে নিশিআঁধার মাঝে
কুসুমসুরভি মাঝে বীণরণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে

এ কবিকথা নয়। এ বাক্যালঙ্কার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে। অরূপবীণার ঝংকারে ঝংকারে এই সংগীতটি অনুরণিত হলেও, তার গায়ক থেকে একমুহূর্ত ছাড়া নেই, তার উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে আনন্দরূপ ধরে উঠছে।' কিন্তু এই আনন্দরূপামৃত-এর স্বাদবাহী গীতি ঠিকানাটি গোরার কাছে অস্পষ্ট রইল। পরের দিন সকালে গোরার সূর্য অন্য মতো উঠল না। সে তার জীবনে একটা নোতুন অর্থ, নোতুন আলোকরশ্মি প্রাণে বয়ে আনল। সেই প্রভাতের আলোয় আলোয় গোরার প্রাণবাউল উঠল, 'খাঁচার ভিতর অচিনপাখী কমনে আসে যায়, ধরতে পারলে মনে দিতেম পাখির পায়।' "আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অ ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি; সেই অসীমকেই আমার ধরতে পারবার জন্য ব্যাকুলতা।" সেই গীতিধারা বয়ে চলল, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার

মানুষ যে রে।" কোথায় পাব তারে? কোন বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে, কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তা পাওয়া যাবে না, স্বার্থ বন্ধন মোচন করতে হবে, মঙ্গল সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া, আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে পাওয়া। গোরা কি করে দেবে, কোথায় দেবে, ঠিক করে উঠতে পারল না। গোরাকে সেই খ্যাপা বাউল পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়াতে লাগল। তবে বেরোবার আগে একটু লজ্জিতস্বরে স্বীকারোক্তি করে গেল—"আমার মাকে ছেড়ে আমি বেশিদিন কোথাও থাকতে পারিনে।" গোরার মা আনন্দময়ী, যাঁর আগমন যেখানে সেখানেই আনন্দে ছেয়ে যায়, তাঁর কল্যাণস্পর্শ ললিতার (রাধারাণীর প্রিয় সখীদের অন্যতমার পরিচয়ে চিহ্নিত) বিদ্রোহকে স্নেহসুধাসিক্ত করে, যিনি স্থিতধী পরেশের চিত্তবিক্ষেপে আশ্বাস আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেন। সুচরিতা নোতুন নোতুন সুযোগ খুঁজে নিয়ে শিশু যেমন মাকে ডাকে, তেমনি নানা উপলক্ষে যাঁকে 'মা' বলে একবার ডেকে নেয় সেই আনন্দময়ী ভারতবর্ষের ভাবপ্রতিমস্বরূপা, জাতিধর্মের ছুৎ, অছুৎ তাঁর কাছে নেই। নিজের জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে ইনি বলেন—"বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বলোককে যেমন নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতন-স্বরূপকে ধারণ করি।" এই সাধনা শাশ্বত ভারতের গোরার সাধনসমুদ্রপারের বন্দর, দেশমাতৃকার, যে দেশের মাটিতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। আনন্দময়ী, "বালিকার পূজার শিবের মত ইহাদিগকে (গোরা বিনয়) তিনি নিজের হাতেই গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ইহারাই তাঁহার সমস্ত আরাধনা গ্রহণ করিয়াছে।" ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণশক্তিকে আপনার মধ্যে পাবার জন্য সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটির ছবিটি দেখেছিল সে আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা সেই ঋষিদের চেয়েছিল যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা, যাঁরা সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন। ভারতের সাধকের, আনন্দময়ীর, গোরার সাধনা ছিল পরমকে দেখা পাওয়ার। এই পরমের আলোকে নিজেকে দেখা, বিশ্ব-মানবাত্মার সঙ্গে নিজের পরিচয় চিহ্নিত করার। গোরা তার একদেশদর্শিতার অন্ধতায় এই আলোকে চিনতেই পারল না। তার সাধনপথে বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল তার অহংবোধ, এবং পারিপার্শ্বিকের যথার্থ মূল্যায়নে ও তার স্বীকৃতি-দানে অসামর্থ্য। সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ হতে থাকল।

সামাজিক সংস্কাররিক্ত রিক্ততাখিন্ন ভারতের প্রতিচ্ছায়াবাহিনী হরিমোহিনীর অভিযোগের কশাঘাতে একদিন গোরার চেতনা হল। সে নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের

কারণ বুঝতে পারল। কিন্তু তার সমাধানের চেষ্টা না করে সে তাকে অ
করল। যে নারীর কল্যাণপ্রতিমা শ্রী, হ্রী, ধী এর আকার তাকে সে
চিত্ত সংক্ষোভে দেখতেই পেল না বা পেতে চাইলই না। তার প্রতি
পল্লীপথে পরিক্রমণ ক্রমে বিষাদ হয়ে উঠল আর তার কারণ রইল তার অ
অবচেতনায় লুপ্ত সে ঠাকুরঘরে তার সান্ত্বনা চাইল। পেল না। অবশ্য ঠ
উপর তার আস্থার পরিমাণও আমাদের অজ্ঞাত। সে বলে ঠাকুরকে সে
কারণ দেশের ভক্তিকে ভক্তি করে। বজ্রনাদে গোরা অবজ্ঞা জানায়, যা
ঠাকুরের পূজো থেকে মরে গেছে তারা মূঢ়; ভুলে যায়, তারা যদি মূঢ়ও হ
তাদেরকেও নিতে হবে সঙ্গে, কিম্বা তাদের ভক্তিনৈবেদ্য যেখানে উৎসর্গ করা
তার সন্ধানও প্রয়োজন। তারা যে সবাই হারাণচন্দ্র নাগ নয় তাদের
পরেশবাবুও আছেন। সে কথা মনে আনতেই কোথায় যেন তার
(স্বচরিতার আত্মোপলব্ধির এক পর্যায়ে পরেশবাবু তার মনে ব্রাহ্ম হিন্দু
সম্বন্ধে উদিত প্রশ্নের জবাব করেন, হিন্দু সমাজে ফেরার পথ নেই এবং হিন্দুর
মতকে ব্রাহ্মমত বলে কিম্বা তাঁর মতের অনুপোষক যাঁরা তাঁরা স্বপরিচয়ে
বলেন বলেই তিনি ব্রাহ্ম)।

তর্ক করে, বক্তৃতা দিয়ে, সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার আবরণে গোরা সব বিরুদ্ধ মতের
দেয়। কিন্তু যখন সে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করে তখন তো তার কোন প্র
থাকে না·· দেশের প্রতি "তাহার অনুযোগের প্রবলতাই তাহার সত্যদৃষ্টিকে অ
রূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়, এবং পল্লীভারতে সমাজজীবনের বিশুষ্ক বলহীনতা
আহত করে। সামনে প্রতিপক্ষ না থাকলে গোরার যেন কিছু বলারই থা
সে সব সময়েই উদ্যতমুষ্টি, তর্কপ্রাণ। হরিমোহিনীর মত যারা আগে থেকে
জেনে বসে আছেন তাদেরকে কিছু বলারই নেই তার। এক অনুভবের
সে উপলব্ধি করে তার ভারতবর্ষ তার মা আনন্দময়ী, তাকে সরিয়ে
উৎসবের উদ্বোধন করেন—বিনয় ললিতার মিলন বিপ্লবের। বিস্মিত বেদন
স্মরণ করে আমার মানচিত্রটায় কেবল আমিই একলা এসে ঠেকব।
তাই হল।

হঠাৎ বিরুদ্ধ ঘটনার প্রবল ঝঞ্ঝাঘাতে সে আবিষ্কার করল অকূল বিশ্ব পারা
বেলাভূমিতে সে একা। নামগোত্র পরিচয়হীনতার তরঙ্গে তার এতদিনের মূল্য
ভিত কেঁপে কেঁপে উঠল। এক গভীর বিষাদে এক নোতুন আবেগের বেদনা
মন ভরে উঠল। আর য়ুরোপীয় ডাক্তারকে পর বলেপ্রমাণ করার জন্য তার
উদ্যত হল না। সে যে অন্ত্যজ, নিজের জন্ম নিয়ে গর্ব করার যে
তার কিছুই রহিল না এতে তার সমগ্র চেতনায় নোতুন ভাবনার উদ্বোধন

আকাশ বাতাস চরাচর এক নোতুন রূপে তার মনে উদ্ভাসিত হল। উদাত্তকণ্ঠে সে ঘোষণা করল—

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

মুহূর্তে সে অনুভব করল আনন্দময়ী তার জন্মদায়িনী না হতে পারেন কিন্তু তিনিই তার সত্যকারের জননী, তিনি এবং তার জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। তার ধ্যানের ভারতবর্ষ তার কাছে নোতুনরূপে সত্যমূর্তিতে প্রকট হল আনন্দময়ীর শাশ্বত সত্তায়। এই আনন্দযজ্ঞের ঋত্বিক পরেশবাবু আর এই ভারতবর্ষের ধ্যানের মন্ত্রোচ্চারণে হ্লাদিনী বা মহাশক্তি, সর্বশক্তি সে রাধারাণী সুচরিতা; বিনয় রইল তার সংগে অভিন্ন হয়ে। সে বলল—"মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাতি নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

কবিতা ও কবিসত্তা

শ্রীসোমেন ঘোষ

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

অনুভূতিটা যখন আসে, ব্যক্তিগত আহরণী শক্তির তারতম্য অনুসারে মানুষ তা' গ্রহণ করে সত্তার গহনে। তারপর সেই অনুভূতিই বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে বিভিন্ন-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য যিনি কবি, মাপকাঠির নিরীখে তাঁর অনুভূতি আর সাধারণ মানুষের অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকে। যদিও একথা ঠিক যে কবিও 'সাধারণ মানুষ', কিন্তু সর্বোপরি, তিনি শিল্পী, স্রষ্টা, আর যেহেতু শিল্পীরা একটু বেশী স্পর্শকাতর হন তাই শিল্পী আর তথাকথিত সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। কবি লেখেন—ঠিক যেভাবে চিত্রশিল্পী রঙ নিয়ে খেলেন,

সঙ্গীতবিদ্ সুরলহরী গঠন করেন—কেননা এঁরা সকলেই নিজেদের মধ্যে স
একটা চাপা বেগ অনুভব করেন। এই আবেগ, সৃষ্টির এই তৃষ্ণাই কবি ত
মাত্রেরই প্রকৃতি। কবি দিনেশ দাশ বলেছেন—

মানুষে মানুষে ঘোরে মানুষের মন—
প্রকৃতিকে নিয়ে শুধু কবির জীবন।
মানুষ যে চোখে চায় মানুষীর দিকে,
কবি সেই চোখ দিয়ে দেখে প্রকৃতিকে।

আশ্চর্যের বিষয়, এই যে তাড়না, ঘাত, একটা সৃষ্টিকামী উত্তেজনা, এটা
সহজাত প্রেরণারূপে প্রত্যেক যুগেই কোন না কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিয়ে
দেখা দেবেও। প্রকৃতপক্ষে, কোন্ সমাজের মাটি যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচন
সর্বাপেক্ষা উর্বর তা' বলা কঠিন। কারণ সাহিত্য বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ব
বস্তুর জন্মদান করেছে।

কবিতা—রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের অধীনে যেমন লেখা হ
তেমনি আবার কবিতা, ধর্মীয় চেতনা, রাজনৈতিক নিগ্রহ, সংগ্রাম ও শান্তির
লেখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কবিতা শুধুমাত্র বিজ্ঞরাই যে লিখেছেন তা
যিনি রাজা, যিনি সন্ন্যাসী, সার্বভৌমিক, যিনি রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও যুক্তিবাদী
সকলেই কবিতা লিখে গেছেন।

কিন্তু কবিতা যদি এই বিভিন্ন ধরনের মানুষের দ্বারা লিখিত হ'য়ে থাকে, ত
এমন সেই অদ্ভুত বিশেষত্ব যা প্রত্যেক যুগেই কিছু না কিছু সংখ্যক মানুষে
বিদ্যমান। আসলে যিনি কবি, যিনি শিল্পী, তিনি তাঁর জীবনাভিজ্ঞতাকে ছ
ভাষায় নতুন অবয়ব দান করতে বাধ্য হন; এ বাধ্যতা তাঁর আপন সত্তার
আপন অন্তরের একটা সৃষ্টিকামী অনুরোধ। কবি দিনেশ দাশের ভাষায়—

জীবনের নীতি খোঁজে শিক্ষকেরা ঠিক,
তত্ত্ব খুঁজে বের করে প্রৌঢ় দার্শনিক।
জীবনের মানে কিছু আছে কিনা আছে—
কবি, শিল্পী খোঁজ করে—দিশা পায় না যে॥

কবির কথা বলতে গিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি টমাস গ্রে তাঁর "The
কবিতায় বলেছেন—

On a rock, whose haughty brow
Frowns o'er old conway's foaming flood,
Robed in the sable garb of woe,
With haggard eyes the poet stood;

Loose, his beard and hoary hair
Streamed, like a meteor, to the troubled air
And with a Master's hand, and Prophet's fire,
Struck the deep sorrows of his lyre.

সম্ভবতঃ ইয়েট্‌স ছিলেন সর্বশেষ কবি, যিনি নিজের চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, বিন্যাস করেছেন এবং যিনি নিজেকে স্বদেশ ও মানবজাতির মুখপাত্র হিসাবে দাবি করেছেন। কিন্তু কবিরা তাঁদের স্বীয়সত্তা ও তাঁদের শিল্পকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতে—

The poet is a man speaking to men.....who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him.

কীট্‌স ঘোষণা করেছিলেন যে কাব্য চরিত্রের অস্তিত্বের সার্থকতা সেইখানে, যেখানে তার কোন স্বরূপতা থাকবেনা—কারণ তা' সব সময়েই অপর এক ব্যক্তি-স্বরূপকে পূর্ণতা দান করে আসছে। ইয়েট্‌সও একই ধারণা পোষণ ক'রে বলেছেন—

My character is so little myself that all my life it has thwarted me. It has affected my poems, my true self, nomore than the character of a dancer affects the movements of the dance.

এ বিষয়ে টি. এস. ইলিয়ট সর্বাপেক্ষা চরম উক্তি করেছেন। তাঁর মতে কবিতা ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং ব্যক্তিত্ব থেকে পলায়ন, এবং কবির আত্মপ্রকাশের জন্য কোনও 'ব্যক্তিত্ব' নেই—তার পরিবর্তে আছে একটি বিশেষ পন্থা এবং যা কেবলি পন্থা, আর যার মধ্যে কবির ভাব ও ভূয়োদর্শন এক অদ্ভুত অভাবিত রীতিতে মিলিত হয়, এবং এইখানেই কবিতার সার্থকতা।

বাস্তবিক পক্ষে কবিতা কবির অন্তরাত্মার একটি উজ্জ্বল ক্ষেত্র, যেখানে কবি পৃথিবীর সবকিছু বস্তুপুঞ্জকে নিজের মনের মত ক'রে গড়ে নিতে পারেন। আর এই কারণেই কবিতাকে যাঁরা গতানুগতিক কোন সাহিত্যিক নিয়ম শৃঙ্খলার নাগপাশে বাঁধতে চান, তাঁরা খুব ভুল করেন। কারণ একথাটা সব সময়েই স্মরণ রাখা দরকার যে—

কবিরা কবিতা লিখে
সম্মানের করেনা প্রত্যাশা।
কবিতা কবির শুধু আনন্দের অভিব্যক্তি
মানুষের প্রতি ভালবাসা॥

(দিনেশ দাশ—"কাচের মানুষ")

এ কথা সব কবিই বোধহয় স্বীকার করবেন যে, তাঁদের বিভিন্ন ধরনের প
থাকা সত্ত্বেও যা তাঁদের শিল্পের মূল, তা' তাঁদের সম্পূর্ণ চেতন মনোবৃত্তির ব
অবস্থিত। আবার এই ব্যাপারটি এমনই একটি শক্তি যার ওপর প্রভুত্ব স্থাপ
যায় না, যা শুধু অতর্কিতে আসে আবার অতর্কিতে যায়। সব শিল্পীরাই
এই অব্যবস্থিত চিত্তের প্রতিফলন ও নৈরাশ্যের সঙ্গে সুপরিচিত যা' কেবলমা
অক্ষম ইচ্ছাবৃত্তিকে ছেড়ে প্রত্যাহারশীর্ষে উপনীত হয়।

O ! 'tis an easy thing
To write and sing ; But to write true, unfeigned v
Is very hard ! O God, disperse
These weights, and give my spirit leave
To act as well as to concive !

(Henry Vaughar

এখনও কি কোন কবি বা সমালোচক সার্থকভাবে কবিতার স্বরূপ নির্ণয়
পেরেছেন ? তাঁরা কবিতাকে এত বিচিত্র আখ্যায় ভূষিত করেছেন, যার
কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা সন্দেহের বেড়াজাল সৃষ্টি হ'য়ে পড়ে। ওয়ার্ড
বলেছেন—"Poetry is the breath and finer spirit of all knowle
শেলীর মতে "Poetry is that which comprehends all science,
that to which all science must be referred." কবির কমকল্পনার
সৃষ্টিই কবিতা। তা কেবল উপলব্ধির ব্যাপার। এর মধ্যে তত্ত্ব, যুক্তির
বা জ্ঞানার্থক কোনও বিষয়ভাবনাকে টেনে আনলে কবিতার মর্মহানি ঘটে।
কল্পনা তাই শুধু কল্পনাই, কেননা—

বস্তু হ'তে কবির কল্পনা
কবি-কল্পনায় দেখি সৃষ্টি হয় নতুন বাস্তব :
তার কাছে বস্তুময় পৃথিবীর শব
মনে হয়, শূন্য, অবাস্তব ॥

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, কবি জীবনানন্দ দাশ একবার লিখেছিলেন—"কবিতা
হ'লে ইমাজিনেশনের দরকার ; এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটির
কি ? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা কবিকল্পনা অথবা ভাবনা। আমা
হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা।"

কবির এই উক্তিটি কিন্তু অনেকাংশেই সত্য। কেননা কল্পনাশক্তি সক
যে প্রখর, বা ধীশক্তিতে সকলেই যে সমান অধিকারী, একথা বলা চলে না।

কবি উল্লিখিত এই 'কল্পনাপ্রতিভা'র তারতম্য অনুসারে কবিতা উচ্চ ও নিম্নমানের হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসসুন্দরী' কবিতায় উচ্চারণ করেছিলেন—

আজ কোন কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ গ্রন্থগীত, এস তুমি প্রিয়ে
আজন্ম সাধনধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনালতা।

পৃথিবীর বহুশ্রুত ও বহুজনধন্য কবি যাঁরা লোকোত্তর প্রতিভাবলে অনন্তকাল ধরে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা সকলেই এই ভাবপ্রতিভা বা Muse শক্তির অধিকারী অবশ্যই ছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর কবি অডেন এক সময় লিখেছিলেন যে, যদি কোন যুবক লেখার উচ্চাভিলাষ নিয়ে তাঁর কাছে এসে বলে "আমার অনেক কিছু বলার আছে", তবে সে কবি মনের উপযোগী নয়; কিন্তু যদি সে এই বলে স্বীকার করে যে, "আমি শব্দপুঞ্জের মধ্যে ডুলতে চাই, তারা কি বলে শুনতে চাই", তাহলে হয়ত কালে সে কবি হতে পারে। যা কবির ব্যক্তিত্ব, তা হয়ত কবিতার মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কবি তাঁর স্বকীয় কবি পন্থার, তাঁর নিজস্ব প্রকাশরীতির সুনিপুণ অধিকারী হতে না পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কবির ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনার মধ্যে অব্যক্ত থেকে যাবে এবং তা অপরের মধ্যে সংক্রমিত হতে সক্ষম হবে না—কেননা মানবীয় অন্তর্দৃষ্টির কাছে আবেদন করাই কবির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

বিভিন্ন কবি ও সমালোচকের নানা ধরনের বিরুদ্ধ মতবাদের জন্য এটা খুব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে একটি অত্যাবশ্যক 'দ্বৈতসত্তা' কাব্যসৃষ্টির অন্তঃকরণে জীবিত থাকে এবং যার যে কোনওরকমের বিশ্লেষণ হতে পারে।

কবিদের দ্বিবিধ প্রকৃতি এক এক মানুষরূপে এবং শিল্পীরূপে। কবিতাও দ্বৈত উৎস থেকে উৎসারিত হয়—প্রথমটি হ'ল যা এক রহস্যময় আভ্যন্তরিক সম্পীড়ন, আর দ্বিতীয়টি, যা সম্পূর্ণরূপে এক চেতন শিল্প শিক্ষা। এটিকে একটি কার্যপ্রক্রিয়া বলা যেতে পারে, যার মধ্যে উভয়েই বিরাজমান এবং উভয়েই মিলিত, অর্থ ও প্রণালী উভয়েই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ, এবং যেখানে দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি উভয়েই তাদের স্বীয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

কবিতা যে কোনও ক্ষণ থেকেই তার যাত্রা শুরু করুক না কেন—অর্থাৎ কোন ঘটনা, কোন আবেগ, কোন চরিত্র, দৃশ্য, কোন অন্তর্দৃষ্টি বা কোন চিন্তা, এসব যা কিছুই হোক, কবিতার মূল প্রসঙ্গ কখনোই স্বতন্ত্রীকরণের ওপর বিরাজ করে না। পরন্তু কবিতার প্রসঙ্গ তার সীমা বর্ধিত করে, ভাবকে উর্বরতা দান করে। যদি একথা মানতে হয় যে, কবি এমনই একজন পুরুষ যিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-পুঞ্জকে তাদের

সৃষ্টি বিন্যাস করতে এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে ক্রিয়াশীল
সর্বদাই প্রগাঢ় যত্নশীল,—তবে এখানে কবির পূর্বোক্ত 'দ্বৈতসত্তা'র প্রশ্ন এসে
কবি যখন তাঁর সৃজনে রত, ইলিয়টের ভাষায় তখন "He is no more
cerned with the social consequences than the scientist i
laboratory—though without the context of use to so
neither the poet nor the scientist could have the convi
which sustains him."

কবি ও পাঠকের মধ্যে কাব্য-পঠন অনুভূতির যা পরিসর, তা' ম
অভিজ্ঞতার মতই বিস্তীর্ণ। কবিতাপাঠের আনন্দ তাই সম্পূর্ণ উপলব্ধি
উদাহরণস্বরূপে Shelley'র "Night" কবিতার সর্বশেষ পরিচ্ছেদের শান্ত স্ব
উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন—

Death will come when thou art dead,
Soon, too soon—
Sleep will come when thou art fled ;
Of neither would I ask the boon
I ask of thee, beloved night—
Swift be thine approaching flight,
Come Soon, soon !

এখানে শেলীর কবিকল্পনায় 'রাত্রি' এক রূপময় অনুভূতিতে পর্যবসিত হ
রাত্রির শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য আন্তর উপলব্ধির বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কবি
রাত্রির আগমন আকাঙ্ক্ষায় নিজের অন্তরস্থ আর্তি ব্যক্ত করেছেন। রাত্রি,
কবির মানসলোকে পৌঁছে কবির অলঙ্কারে, ভাষায়, বর্ণনায় এক সুষমামণ্ডি
ধারণ করেছে। যদি কবিতাটির পশ্চাৎপটে কোন তত্ত্বাভিপ্রায় থাকে তা
কাব্যপাঠের সময় প্রথমেই ধরা পড়ে না, আসে প্রথমে সূক্ষ্ম অনুভূতি, উ
—সর্বশেষে মূল মর্মকথা।

কিছু পাঠক আছেন, যাঁরা সামান্য সঙ্গীত ও গতি ছাড়া কবিতা থেকে অন্য
আহরণ করেন না। যদিও কবিতা বিভিন্নভাবে মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছে,
যোগান দিয়েছে—কিন্তু তাই বলে আমরা কবিতাকে কোন বিশেষ নৈতিক
প্রচারের বাহন হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নই। শিক্ষাদানের পরিবর্তে কা
কাজই হল প্রদর্শন করা, কিন্তু তাই বলে নীতিগর্ভ কবিতার প্রতি রাজদ্রো
করাও কোন নৈতিক সন্তোষের পরিচায়ক নয়, কেননা সে আপনিই একটি রী
আমাদের কাছে পৌঁছায়।

কবিতা সমস্ত মানুষকে সঞ্জীবনী সুধা দান করে। কীট্‌স তাই বলেছিলেন যে, কবিতা ঠিক যেন শোণিতধারা, মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি যারা একত্রে বহমান, এবং আরও, কবিতা আমাদের এই পৃথিবীকে স্পর্শ ও আস্বাদ করতে, শুনতে ও দেখতে আদেশ করে, এবং যা কিছু কেবলমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত ও সমস্ত, যা প্রস্রবণের মত সম্পূর্ণ আশ্বাস, স্মৃতি কিংবা শারীরিক চৈতন্য থেকে উৎসারিত নয়, তা থেকে দূরে সরে থাকতে কবিতা সর্বদাই আমাদের প্রস্তাব করতে ব্যগ্র।

কবিতার মূল উৎপত্তি, তা যে কোনও ব্যক্তিস্বরূপ থেকেই উৎসারিত হোক না কেন, এবং যে কোনও ঐন্দ্রজালিক, অতীন্দ্রিয় গুণই কবিতার মধ্যে দৃঢ়সংলগ্ন থাকুক না কেন—এদের পৃথকীকরণ কখনও সম্ভব নয়। ভাষার নিজস্ব একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় মাধ্যম আছে, এবং যা কবির স্বীয় চেতনার জন্য একটি নতুন স্বাভাবিক ব্যক্তিস্বরূপ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যেতে পারে যে, কবির কাছে ইন্দ্রিয়জগৎ এবং চিন্তা ও আবেগের অন্তর্জগৎ এক, অবিচ্ছেদ্য। আর উভয়েই উভয়কে শব্দপুঞ্জের মধ্যে দ্রবীভূত করে।

যিনি সুকবি, তিনি কখনই এমন কোন জিনিস গ্রহণ করেন না, যা তাঁর কাছে সমধর্মী আবশ্যকতারূপে প্রতিভাত হয়। তিনি তাকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করেন, এবং এই ব্যাপারটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে as easy to have too many images as too few.

প্রকৃতপক্ষে, বিসদৃশ হলেও ন্যায়সম্মত যুক্তির মত বলা যায় যে কোনও কবিতাই তার নিজের কোনও বিশেষ সমষ্টিগত অংশ নয়, বরং কবির বিন্যাসপদ্ধতি অনুযায়ী এটিকে বর্ণনা ও চিত্রকল্পের একটি সতেজ আত্মীয়তা বলা যেতে পারে, যা পরস্পর পরস্পরকে রূপান্তরিত করছে।

এ পর্যন্ত আলোচিত উদাহরণগুলি সহজ, অথচ কাব্যিক-প্রতীকের শক্তিশালী নিদর্শন, যা চেতন আবেগ ও নৈতিক লিপ্ততার সঙ্গে শৃঙ্খলিত, সন্নিবদ্ধ। কিন্তু উৎকট কল্পনাকারী কবিগণ পাঠকবর্গের মনোভূমিতে একটি রহস্যের বেড়াজাল সৃষ্টি ক'রে প্রতীককে আরও প্রবঞ্চনাময় ভঙ্গিতে গ্রহণ করেন। কোলরিজ বলেছিলেন যে কিছু সংখ্যক ভাল কবিতা কেবল এমনই থাকে যা, "generally and not perfectly understood." এবং এই কথাটি যে সত্য তা, ব্লেকের কবিতা "The Sick Rose" পড়লেই বোঝা যায়। যেমন—

O Rose, thou art sick!
The invisible worm,
That flies in the night,
In the howling storm,

Has found out thy bed
Of crimson joy ;
And this dark secret love
Does thy life destroy.

এই কবিতাটির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তু, আবেগময়তা ও নৈতিক অর্থ, এই কোনটির মধ্যেই কোন সহজ সমীকরণ অনুপস্থিত। উক্ত তিনটি পর্যায়ই সমসা রূপে একটি বাক্যের মধ্যে এমন সুদক্ষভাবে বিধৃত যা, কিছু অশুভ এবং উগ্র অ ও অনুভূতির সৃষ্টি করে,—কেবলমাত্র সহজ অথচ কুলক্ষণাক্রান্ত শব্দপুঞ্জের অন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, কবিতাটি একটি বাগানের মহামারী সম্পর্কে উচ্চা ভাষাময় রূপ নিয়েছে একটি গোলাপ ও বিষাক্ত কীটকে ঘিরে। কিন্তু কবি ভাষা পঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই বহন করে যে, কবিতাটির মূল অ প্রতীকময়। এখানকার গোলাপ, বিষাক্ত কীট এবং পারিপার্শ্বিকতা কেব কবিতাটির আভ্যন্তরীণ নাটক—যার ফুলের বাগানের সঙ্গে কোন সম্পর্কই কবিতার সমস্তটাই অসাধারণভাবে সজীব, কিন্তু সম্ভবতঃ কোন দুই ব্যক্তিই কবিতা থেকে এক অর্থ পাবেন না।

একথা বলা যেতে পারে যে বাংলা দেশের আধুনিক ও কোন কোন সাম্প্র কবিদের চিত্রকল্পের ব্যবহারেও ব্লেকের মতই এইরূপ দুরূহতা বিদ্যমান। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলা যেতে পারে। একটি কবিতায় বলেছেন—

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি ?
জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে ?

('প্রতীক্ষা', দশমী)

এখানে উল্লেখ্য যে কবি 'ফাল্গুনী' কথাটির ক্ষেত্রে কি অর্থ জ্ঞাপন করতে চেয়েছে অর্জুন ? না ফাল্গুন মাস ? বাস্তবিক ঠিক কোনটিই নয়। এখানে ব্যঞ্জনা বসন্তকাল, কিংবা তাও নয়, বসন্তের সঙ্গে যৌবন, তার প্রাণশক্তি, উল্লাস, উদ্দা সঞ্জীবনী সবকিছু মিলে মিশে একাকার। তাই ঠিক কোনটি মূল অর্থ দুষ্কর। আসলে সুধীন্দ্রনাথ যে চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, তার শব্দগুলি অনেক অপ্রচলিত বলেই ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য অনেকখানি তিরোহিত হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যতীত কবি বিষ্ণু দে'র কোনও কোনও কবিতায় প্রেম, সমাজ, জীবন প্রভৃতির চিত্রকল্প এক হ'য়ে দেখা দিয়েছে, যার ফলে কবি কখন প্রিয়ার কথা বলছেন এবং কখন যে ঐতিহাসিক সমাজজীবনের কথায় উ

করেছেন তা' বোঝা যায় না। এ ব্যাপারটিও কবিতার দুরূহতার একটি অংশ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কবি যেখানে বলছেন—

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।
কাল রজনীতে ঝড়ে হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।

('ক্রেসিডা' "চোরা বালি")

সেখানে কবিতার দুর্বোধ্যতা সহজভাবেই প্রকট। কেননা কবিতার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তৃতীয় চরণটির আপাত কোনো মিল পাঠকের চোখে পড়ে না। ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রণয়ে হেলেনের প্রেম যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছে কবি যদিও তারই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরগুলি অনুক্ত থেকে গেছে।

কবিতার অংশরূপে এই চিত্রকল্প ও প্রতীকের কথা বলতে গিয়ে ইয়েট্‌স বলেছিলেন—"A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame." অবশ্য একথা স্মরণযোগ্য যে "প্রতীকের ব্যবহার হরধনুর মতো। খুব কম কবিই তাতে জ্যা রোপণ করতে পারেন।"

যদিও, কাব্যের দুরূহতার সম্বন্ধে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার লিখেছিলেন—"যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে, তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়।" অপরপক্ষে, ইলিয়টও সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন—"The poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to disolate if necessary, language into his meaning". কিন্তু এসত্ত্বেও একথা ভুললে চলবে না যে, যথার্থ কবিমনের বাণীময় আত্মপ্রকাশের নাম কবিতা হলেও—তা' সর্বজনবেদ্য, সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনীন হওয়া চাই। কেননা—"Poetry is the earliest and remains the most concentrated and intense form of communication among the arts of language". সুতরাং এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা যদি কবিতায় অধিকমাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তবে কবিতার সৌন্দর্যহানি ঘটা কিছু অসম্ভব নয়।

এক অর্থে, সব কবিতারই নাটকীয় উপাদান আছে। প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ-ভাবে কবি কোন না কোনও ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেন,—তিনি কোন পাঠক হতে পারেন, কিংবা কবির ব্যক্তিজীবনের কোন প্রতিমূর্তি হতে পারেন অথবা তা' কোনও ভিন্ন আবেশও হতে পারে যা' কবির চেতনায় সক্রিয়। কবি সর্বদাই ভূমিকাবৃত থাকেন। কখনও ভবিষ্যদ্বক্তা, কখনও প্রেমিক, চিন্তাবিদ্, কখনও বিলাপকারী,

মনুষ্যান্বেষী, আবার কখনও বা বিদ্রূপকারী এবং এই ভূমিকায় একটি বিশেষ ম
পরিস্থিতিতে কবি উৎফুল্ল, গর্বিত, নৈরাশ্যপীড়িত, কখনও তিক্ত-অভিজ্ঞ
জিজ্ঞাসু, আবার কখনও বা অসন্দিগ্ধ।

বাইরের উৎকট বস্তুতান্ত্রিক জগতের মধ্যে যে সুন্দর, যে অপরূপতা লুকিয়ে
তাকে পাঠকের চিত্তে প্রস্ফুটিত করাই কবি তথা সাহিত্যিকের লক্ষ্য। এই
সম্পাদনের জন্যই কবিকে ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে আনতে হয় ও এই
সাহায্যেই ভাষাতীত ব্যঞ্জনা ফোটাতে হয়, আর এই জন্যই কবি অনির্বচনী
সৃষ্টির আবেগ অনুভব করেন।

এক্ষেত্রে কবিকে দ্বিবিধ কার্য একসঙ্গে করতে হয় সব্যসাচীর মত—এক
কাররূপে ও অপরটি চিত্রকররূপে। কিন্তু এই দু'কাজের মধ্য দিয়ে অনুভূতি
জাগিয়ে তোলার জন্য অবশ্য, কবির যোগ্যতা অত্যাবশ্যক।

কারণ, হায়রে কত কাজ তাকে করতে হয়
চিত্রণে পটু, দক্ষতা চাই সঙ্গীতেও।
এক লহমার দৃশ্যকে পটে ধরতে হয়—
এক লহমার গাঢ় অনুভূতি জানতে হবেও।
মানি বটে ঠিক ছবির মতন স্পষ্ট নয়।
মানি তার কথা গানের মতনও গভীর নয়।
কিন্তু শব্দে যতোটা ফোটানো সাধ্য হয়,
বাণীর গম্য সে অতলে তাকে নামতে হয়।

এই 'এক লহমার দৃশ্য' ও 'এক লহমার গাঢ় অনুভূতি'র কথা প্রকাশের ব্যগ্রত
সাহিত্যসৃষ্টির মর্মমূলে বিদ্যমান। সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবী
তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে যা বলেছিলেন অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয়টাই সবচাইতে বড়
ভঙ্গিটাই যে নিত্য নূতন রহস্যের স্রষ্টা—এ কথাটি সাহিত্যের একটি খাঁটী
কেননা একই বিষয়বস্তুকে আমরা বিভিন্ন কবির নানান প্রকাশভঙ্গিতে নান
পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে
"অর্থসমূহ পূর্বে দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও রসপরিগ্রহ করার জন্য তাহারা বসন্ত
বৃক্ষরাজির ন্যায় 'কাব্য-সাহিত্যে নূতন করিয়া শোভা পায়।"

সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, প্রেম, নারী, ঈশ্বর, জিঘাংসা,
সমাজ ও ব্যক্তিমানুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে কবি যে ধরণের ইঙ্গিতই করুন না কেন ;
সম্বন্ধে যে ধরণের উক্তিই কবি প্রকাশ করুন না কেন ; স্মরণযোগ্য যে, যে স
দর্পণে কবি নিজেকে খোঁজেন, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মত তাঁকে সেই সম
অন্তর্গত হতে হবে, তার সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি ও অন্তরায়গুলিকে সহ্য করতে

এবং সকল সাধারণ মানুষের মতই সেই সমাজ তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করতেও নিশ্চয়ই তিনি অভিলাষী হবেন; কিন্তু এই সমাজ অনুভবকে আপন কবিকর্মে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলার জন্য কবির একটি বিশিষ্ট প্রকাশ মাধ্যম থাকা চাই।

কবি আমাদের দিতে পারেন এক—"Wonderfully full, new and intimate sense of things." কেননা তিনি আমাদের এই কর্মময় জগৎ থেকে ব্যক্তি বা বস্তুময় জগতে অপসারিত করেন, যেখানে বস্তু পরিবর্তিত হয় না এবং যেখানে আমরা বস্তুর ধ্যানে তন্ময়তা লাভ করতে সক্ষম। কবি স্বয়ং আমাদের জগতেই বাস করেন যা, বিশৃঙ্খল অনুভূতির অযথার্থতায় পরিপূর্ণ। এই জগতে বাস করেও যে জগৎ তিনি তাঁর কাব্যে গড়ে তোলেন, তা একপ্রকার কাল্পনিক আদর্শ সুখরাজ্য 'a kind of Utopia,' যেখানে কল্পনার প্রতিটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে সজীব এবং একই সময়ে অপরিহার্য ইন্দ্রিয়সুলভ আদর্শে ক্রিয়াশীল।

সাহিত্যকর্ম, জেমস্ জয়েসের মতে হল মানবাত্মার শাশ্বত দৃঢ়ীকরণ; জীবন স্বয়ং যে মীমাংসায় উপনীত হয়, সাহিত্য তার অধিক কোন চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করে না। কিন্তু সাহিত্যের আধেয় বস্তুসমুদয় যাই হোক না কেন—সঙ্গীতের আনন্দ প্রকাশই হোক অথবা হতাশা, নির্মলতা, সংসারবৈরাগ্য অথবা নৈরাশ্যই হোক—এর অস্তিত্বের যাথার্থ্য মানুষের অভিজ্ঞতাসৃষ্ট কোন শক্তিরই সাক্ষ দেয়, কোন বস্তুর নিজস্ব সজীবতা ও পদ্ধতিকে ধারণ করে। শুধু তাই নয়, সাহিত্য—জীবনের হতবুদ্ধিতার অন্তরালে কোন অলৌকিক সৃষ্টিশীল নিয়ম আছে কিনা তা প্রকাশ করে, যেখানে মানুষ একটা প্রত্যয় পেতে পারে, পেতে পারে এই বিশ্বাস যে, সে স্বয়ং ঊর্ধ্বর সৃষ্টিক্ষম শক্তি ও আকৃতির এক মাটি ও উৎস। মানুষের কবিতা, বিষয় ও রীতি, আকৃতি ও আধেয় বস্তুসমূহের ওপর অক্ষয় প্রমাণস্বরূপ স্থাপিত হয় কেবলমাত্র এই জন্যই নয়, যে মানুষ ক্লেশ ভোগ করে, সহ্য করে এবং আবার নিজেকে সৃষ্টি করে, পরন্তু মানুষ বিশৃঙ্খলতা থেকে সৃষ্টি করতে পারে শৃঙ্খলা, হতবুদ্ধিতার বিপরীতে ক্ষণিকের স্থিতধীরূপ। সম্ভবতঃ ক্ষণিক—স্বয়ং স্রষ্টার জন্য এবং তাঁর স্বতন্ত্র পাঠকবর্গের জন্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিনশ্বর,—যেহেতু পুরুষানুক্রম এর অর্থাৎ কবিতার স্বাদ গ্রহণ করে এবং এটি জাতির সম্মিলিত চেতনাবোধের একটি অংশ হ'য়ে দাঁড়ায়—সর্বদেশের, সর্বকালের, সকল মেজাজের, সর্ব ধর্মের, সকল শ্রেণীর, সকলবৃত্তির মানবমানবীর লিখিত এই কবিভাষাই চিরপ্রবহমান মানবীয় রীতি।

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-ধর্ম

শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

স্বদেশ-ধর্ম হইতেছে স্বদেশের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ, স্ব
প্রতি দায়িত্ববোধ। স্বদেশ যে নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি মা, সজন দিনের
তাহার নাড়ীনক্ষত্রের সুনিবিড় যোগাযোগ বন্ধন, 'চিত হতে চিত দিয়া' হৃদয়স্প
অনুভূতি, তাহা মর্মের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, অন্তস্তলের মধ্যে উপলব্ধি করিতে
জননী এবং জন্মভূমি যে স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী, মহীয়সী, শ্রেয়সী, সে
পবিত্র বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত হইতে হইবে। স্বদেশ বলিতে যে মনের
স্বতঃস্ফূর্ত গৌরববোধ, আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রদ্ধাসুলভ নিষ্ঠা, অন্তরের আ
নিজস্বতাবোধ, তাহা হৃদয়ের মধ্যে কলতানমুখর স্রোতস্বিনীর মতো উচ্ছলিত
উঠিবে। 'মা তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁ
অনুরণন সর্বদেহে, সর্বমনে, সর্বশিরায়, উপশিরায় আনন্দপুলকের শিহরন
দিবে, রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিবে, ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া গণ্ডদেশ বাহিয়া আ
গলিয়া পড়িবে। যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার, থাক্ প্রাণ, যাক প্রা
আমার, মা আমার।—এই বাণীব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে। অসহায় সন্তান
মাকে সহায়, সম্বল ও নির্ভরের একনিষ্ঠ দেবী মনে করে, তাঁহার নিকট
আবদার, মান, অভিমান, তিরস্কার, ব্যথা বেদনার ফরিয়াদ ঘোষণা করে,
স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশবৎসল, দেশের সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত মহামানবের দেশ-জ
নিকট সকরুণ প্রার্থনাসূচক প্রশ্ন :—

'শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্য-মন্ত্র—যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ বেদন
লক্ষকোটী সন্তানের, প্রশান্ত বদন ;
তবু ফুটাইতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক, ভূলোক !'

(প্রিয়ংবদা দেবী

স্বদেশ-ধর্মের, স্বদেশনিষ্ঠার, স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষা হয় যখন দেশের সম্মুখে
সংকটময় দুরবস্থা উপস্থিত হয়। দেশকে ভালবাসার, দেশকে আপন জ্ঞানে

ভাবা, দেশকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা-সম্মান করা, তাহার সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সম্পদ-অভাবের চিন্তা প্রতিটি স্বদেশ-প্রেমিকের গুরুলব্ধ ইষ্টমন্ত্র। স্বাধীনতা তাহাদের জন্মগত অধিকার। হীনতার কদর্যতার পরিস্থিতির মধ্যে মায়ের অশ্রুভরা মলিন মুখখানি বীর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করায়—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়"

সেইজন্য তাহার সন্তানের তেজদীপ্ত, বীর্যপুষ্ট, কম্বুকণ্ঠের আহ্বান—'বলো বন্দে মাতরম্, বলো বন্দে মাতরম্'। মা বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হইয়া আসে, আনন্দপূর্ণ মুখমণ্ডলে হাসি, অশ্রুর মিলন বিরহের বেদনা আনন্দের অভিনয় হয়, সমস্ত প্রাণে সমস্ত হৃদয়ে মাতৃ বাহুপাশে বদ্ধ হওয়ার মিলনানন্দে এক স্বর্গীয় সুষমা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তাহার 'মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান, চোখে আসে জল ভরে'। কখনো সে মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করে—

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরের নিয়োজিতে তব কাজে।

সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সে কখনও বা বন্দুকের সঙ্গীণ উচাইয়া, অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় প্রহরায় রত থাকে, কখনও বা দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়—

"চল্‌রে চল্‌রে চল্
উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
... ...
চল্‌রে চল্‌রে চল্।"

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশধর্মের বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে। কালবৈশাখীর অপেক্ষামান আশীর্বাদ, শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ, পদে পদে কণ্টকের অভ্যর্থনা, পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা, সে এক সংকটময় চরম দুর্দিন, দুঃসময়। হিন্দুর সনাতন ধর্মের বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। তখন সে গীতা ছাড়িয়া 'মিল' পড়িতেছে, উড়িষ্যার শিল্প-প্রস্তর ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখিতেছে, কুমার-সম্ভব ছাড়িয়া স্থইনবার্ণ পড়িতেছে। দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার মধ্যে মানুষের মানবিকতার চরম হীনতা। ইংরেজ গালি দিতেছে 'কালা আদমী, বলে', Naked fakir বলে, কুকুরের মত তাহাদের নিকট আমরা ঘৃণিত। মানবিকতার সে এক চরম গ্লানিময় পঙ্কিল অবস্থা।

এই অবস্থায় জাগরিত হয় মানবচেতনা। দ্বন্দ্বের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে, সংঘর্ষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নূতন স্বজাতীয়তা, স্বদেশপ্রেম। 'Man is born free but

every where he is in chain. এই পরাধীনতা, নীচতা, হীনতা, ও সং
দূষিত বাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মানবপ্রেমিক, স্বদেশপ্রেমিক, জাতি প্রেমিকে
বাণী—

'হবে, হবে, হবে, জয়
হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী'

কেবলমাত্র 'Have faith in yourself and stand upon that faith a
strong' তাহার মরণের মুখে মারণের বাণী। তাহার চিন্তা 'If winter
can spring be far behind.' তাহার মনের মধ্যে, হৃদয়ের অন্তর্গহ্বরে,
শিরায়, শিরায় প্রাণশক্তির জীবন্ত স্পন্দন—নবীন আশার তূর্য যেন বাজে।
মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। ঐ সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া
হবে আশা।'

Eternal spirit of the chainless Mind !
Brighters in dungeons, Liberty, thou art—
For there thy habitation is the heart
The heart which love of thee alone can bind ;

(Byro

সংঘাতের মধ্যে, সংঘর্ষের মধ্যে, নিপীড়নের মধ্যে, শাসনের লৌহ নিগড়ের
নিষ্পেষণে সৃষ্টি হয় বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, ফরিয়াদের, অভিযোগের। এইবার
শুনিয়াছে নূতন প্রাণের গান—শিকল ভাঙ্গার গান। 'ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল,'
আমরা 'আনিব রাঙা প্রভাত।' আমরা 'অরুণ প্রাতের তরুণ দল।'

উনবিংশ শতাব্দী রত্নগর্ভা বীরপ্রসূ জননী, বিভিন্ন মণি কাঞ্চনের যোগা
যুগসন্ধিক্ষণ। অগণিত নক্ষত্ররূপ মনীষিগণ জীবনাকাশে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া শুক্র
ন্যায় দীপ্তপ্রভ—মণি, হীরা, পান্না, চুনি, জহরৎ সদৃশ। রাজা রামমোহন
রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত।

প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যে যখনই মানুষের মানবিকতার অপমান হইয়াছে,
ধর্মবোধের জয়কেতন উড়িয়াছে, ন্যায় দাবীর উপরে অত্যাচারী বিদ্বেষী, হি
প্রতিপত্তিশালীর লোলজিহ্বা লোলুপ দৃষ্টিতে নিপীড়ন করিয়াছে তাহাকে রাহুর
নিপীড়ন করিয়াছে, তাহাকে বর্ণবৈষম্যের গণ্ডিতে শূদ্র বলিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করি
তখনই ভগবানের বাণীবাহক হিসাবে, অগ্রদূত হিসাবে, মানস সন্তান হিসাবে
মনীষীদের জন্ম হইয়াছে—সাধুদের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কর্মকারিদের
বিধানের জন্য।

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-ধর্ম

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশধর্ম যে সব যুগস্রষ্টা রথীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত —যাহারা চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়—যাহাদের নাম না লিখিলে আমার লেখা অসম্পূর্ণ থাকিবে, মনের ক্ষুধা অভুক্ত থাকিবে, আমার লেখনী কলঙ্কিত হইবে, কেবলমাত্র তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ও আদেশ স্মরণীয় বেদ, উপনিষদ। বিদ্যাপতির ভাষায় লিখিতেছি,

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।

তিনি বিবেকের মানসপুত্র। আমি নাম দিলাম চৈতন্যদেব। চেতনার, আনন্দের হ্লাদী শক্তি। তাঁহার স্বদেশ ধর্মের বাণী—বর্তমান ভারত, ভাববার কথা, পরিব্রাজক ইত্যাদি। পরোপকার, মানবিকতাবোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠান, স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা, ভালবাসা, নিঃস্বার্থ, নিষ্কামকর্ম—মূলে আত্মত্যাগ, আত্মসংযম। সংযমই শক্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে সংযমই সৌন্দর্য। Keats-এর মতে 'Truth is beauty, beauty truth.' তাঁহার বাণী সত্যের নিকষে পরীক্ষিত। তাঁহার অগ্নিগর্ভবাণী—শোণিতে শোণিতে অগ্নিবীণার ঝংকার আনিয়া দেয়। তাহা শৌর্য, বীর্য্যের সাধনায় সিদ্ধ। নিষ্ঠা, রুচি, প্রীতি, প্রেম, ভাব, মহাভাবের স্তরে উন্নীত প্রজ্ঞাপুরুষের বাণী। তাহা চেতনার, কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের বাণী। মুখে শান্ত, সৌম, ধ্যান গম্ভীর সুন্দর প্রশান্তির বাণী। বলবীর্য সাধনের বাণী। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী।

স্বামীজির পর স্বদেশ-মন্ত্রের উদ্‌গাতা হিসাবে আমরা রাজা রামমোহনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। রামমোহনের অনুবাদ সাহিত্যে স্বদেশধর্ম রূপপরিগ্রহ করিয়াছে অন্ধ, মায়ামোহবিজড়িত কুসংস্কারের দূরীকরণে—হিন্দুধর্মের সনাতনী আদর্শউজ্জীবনে, মানবপূজায়, দেবপূজার পরিবর্তে মানবসেবায়, প্রকৃত ধর্মের মূল্য নির্ধারণে। স্বদেশপ্রেমে স্বজাতীয়তাবোধে রামমোহন রাজা, মনের রাজা, মনের বাদশাহা। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতার ব্যাখ্যানে, অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী, মিথ্যাধর্মের মোহে মোহগ্রস্ত, নিজ নিজ স্বার্থসন্ধানী লোভী, গোঁড়া, মূর্খ, টিকিধারী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জ্ঞানান্ধ মনে তিনি দৃষ্টিদান করিলেন। তিনি একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ মন্ত্রে দীক্ষিত। স্বভাব স্বাতন্ত্র্যের নবজাত শিশু—স্বাধীনচিন্তা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রাণপুরুষ। সমাজবিপ্লবী মেঘনাদ, বীরশ্রেষ্ঠ। উনিশ শতকের নবজাগরণের বীর সন্তান। তাঁহার ব্রাহ্মণ সেবধি, সংবাদকৌমুদী পত্রিকা, বেদান্তসার, বেদান্তগ্রন্থ, উপনিষদের অনুবাদ গ্রন্থ, সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধীয় বিচার, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব,

মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষ প্রচার করা, প্রকৃত ধর্মচেতনার উন্মেষ দান করা। '
দর্পণ'-এর বিরুদ্ধ বিরূপ সমালোচনা তাঁহার স্বাধীন চিন্তার পরিচয় বহন
বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম—সমাজসংস্কার, প্রগতিশীলচিন্তা, সমাজের ভণ্ডামি,
বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বিদ্ধ সমালোচনা করা।

ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনীতে স্বদেশধর্ম বাণী মূর্তি লাভ করিয়াছে দেশের বহুমুখী
বিধানে। তাঁহার রচনা শিক্ষাপ্রসার, সমাজ গঠন, ন্যায় ও নীতি প্রতিষ্ঠার
অতি ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত। সাহিত্যিক আঙ্গিক পারিপাট্যের পরিবর্তে,
চেতনার দ্বারা তাহা উদ্বুদ্ধ। সমাজসংস্কারক ও লোকগুরুহিসাবে তিনি
মন্দিরে পূজারীপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার কথামালা, বোধোদয়, চরি
প্রভৃতি শিক্ষাগুণশীল গ্রন্থ। তাঁহার শকুন্তলা ও সীতা পারিবারিক
স্নেহময়ী মূর্তিমতী চিন্ময়ী দেবী। তাঁহার রচনায় দৃঢ় সংকল্প পুরুষত্ব ও কুসুম
হৃদয় বৃত্তির দ্বৈত প্রকাশ—তাঁহার বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব। ব্যথাতুর
তীব্র ফরিয়াদ—'হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া
ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই,—সদাসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লে
ধর্ম রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরমধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজা
গ্রহণ না করে।' 'অতি অল্প হইল' 'আবার অতি অল্প হইল' তীব্র হা
রসমিশ্রিত রচনা—উপলক্ষ্য বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিতর্ক-দেশজ কুসংস্কারের নৃশ
বিরুদ্ধে তীব্র গ্লানিকর শ্লেষোক্তি—নবজাগরণের গৌরবময় যুগটি তাঁহার প্র
ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত। চরিত্র বৈশিষ্ট্য 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসু
মাহাত্ম্যে মহৎ।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম
নক্সা, মদ খাওয়া বড় দায়,-এতে স্বদেশ ধর্ম, ন্যায়নীতি বোধে উজ্জ্বল। ব্যঙ্গ বি
বিষ দাঁত, হুল এখানে সকল কদর্য্যতা, নীচতা, হীনতা, ভণ্ডামি, নষ্টামি ইত
জালজুয়াচুরিকে তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। পথ ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে, বিপথগা
বিরুদ্ধে, নির্দেশক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক হিসাবে লেখকদ্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আ

রবীন্দ্রনাথ—মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি কক্ষে কবির গমনাগ
তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যে, শিল্পে, সমালোচনায়,
শব্দতত্ত্বের প্রসঙ্গে, ধর্মে, দর্শনে, শিক্ষায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজনী
ইতিহাসের আলোচনায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রন
লেখনীর অবাধ সাবলীল গতি সর্বত্র লক্ষনীয়। তাঁহার গদ্য লেখা সর্বথা দৃষ্টি
নূতনত্বে, প্রকাশভঙ্গীর কারুকার্য্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

নাট্য সাহিত্যে 'কুলীনকুলসর্বস্বের' অবদান পরানুকরণ ত্যাগ—এখন হ

সমাজের পাশা বদলের শুরু, ঘৃণ্য কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক বিদ্বেষ। প্রথম সত্যকারের সামাজিক চলচ্চিত্রের ছায়ালোক ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। মানব-হৃদয়ের গভীর অনুভূতিরসে তাহা আবার জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সমস্যার দ্বন্দ্বে ক্লান্ত মানবমনের কান্নায় পূর্ণ। প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে উপহারের সমালোচনা—'রামমোহন—বিদ্যাসাগর যে নূতন সমাজ-চেতনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই একটি বিশেষ সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণের হাতে নাটকীয় রূপ লাভ করিল।' কুলীনকুলসর্বস্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক লেখক বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, এবং আরও নানা কুপ্রথার নিবারণ কল্পে বহু নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। তন্মধ্যে উমেশচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মধুসূদনের স্বদেশধর্মের বাণী, আধুনিক সভ্যতার অসংরুচিকে মিথ্যা অনুকরণের জন্য অনাচার কুৎসার, বিকৃত ভাবকে উপহাস করিয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা, নামক প্রহসনে নৈতিক সুরুচির প্রশ্ন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনে বৃদ্ধ হইয়াও যুবতীর প্রতি মুগ্ধ হওয়া, প্রাচীন হইয়াও অর্বাচীনদের অনুকরণে লিপ্ত হওয়ার জন্য সংস্কার ও মিথ্যার ধর্মাচারে কবি মিছরির ছুরি হানিয়াছেন—মিথ্যা যবনিকা অন্তরালে কঠোর নগ্ন মূর্তি। নাটক ত্রয়ের মধ্যে কৃষ্ণকুমারী নাটকে দেশরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে কৃষ্ণকুমারীর আত্মবলিদান আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে।

দীনবন্ধু মিত্র—সমাজসচেতনশিল্পী। 'নীলদর্পণ' কেবলমাত্র জীবনের আবেগ মুক্তির কাব্য নহে, উৎপীড়ন মুক্তিরও নাট্যকাহিনী। জাতীয় মর্যাদাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইহা জাতীয়প্রীতিতে উজ্জ্বল। প্রগতিশীলতা ও উগ্র বাস্তবতার পূজারী বলিয়া দীনবন্ধু তৎকালীন সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতির মূলে লেখনীরূপ কুঠার দ্বারা কঠোর আঘাত হানিয়াছিলেন। মদ্যপানের আতিশয্য, ঘরজামাই প্রথা, বৃদ্ধের বিবাহ, কুসঙ্গে চরিত্রহানি প্রভৃতি তৎকালীন বাঙালী সমাজের দুর্বলতাগুলিকেও নানা নাটকে, নাটকল্প প্রহসনে অঙ্কিত করিয়া তাহার বিশ্রী রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, লীলাবতী, জামাই বারিক ও কমলে কামিনীতে হাস্যরসসিক্ত প্রহসনের ছবি আছে। রসিকতা, তাঁহার তীক্ষ্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তর যোজনার অসাধারণ নৈপুণ্য, তাঁহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সার্থক ও সাবলীল প্রয়োগ এই নাটককে স্মরণীয় করিয়াছে। তরুণ বাঙালী সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগাসক্তি, তাহাদের খামখেয়ালী দুরন্তপনার নিত্যনূতনলীলা স্ফূর্তি এই নাটকের দৃশ্যগুলির মধ্যে আশ্চর্য সরসতা ও স্বভাবানুবর্তিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র—গিরিশচন্দ্রের যুগ হইতে শুরু করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ পর্যন্ত

দেশাত্মবোধের প্রবল উদ্দীপনা ও নবোজ্জীবিত ভক্তিরসের প্রবল বন্যা উচ্ছলি
উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্বজাতীয়তাবোধে, জা
উদ্বুদ্ধ, প্রাণবন্ত—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এক মহৎ উৎসর্গের আধারে বিধৃত।
'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' 'ছত্রপতি শিবাজী' স্বদেশবিপ্লবের যুগমানসে
দেশপ্রেমের আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাবটি তাঁহার লেখায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত।
প্রেমের রসে তাহা গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার অদম্য বাসনা
রচনার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল-এর কল্কি অবতার, ত্র্যহস্পর্শ, পুনর্জন্ম-এর মধ্যে ব্যঙ্গ-বি
ছুরি শানিত। কপট ভণ্ডামির মুখোশ লেখকের বলিষ্ঠ লেখনী ভঙ্গিমায়
প্রকাশ করিয়াছে—চালাকির নষ্টামিকে কঠোর আঘাত হানিয়াছে। ঐতি
নাটকগুলি চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপাদিত্য, মেবার-পতন, দেশপ্রেমে উজ্জ্বল সজী
উদ্দীপনাময়ী। দেশকে মনেপ্রাণে ভালবাসার প্রতীক। দেশকে জন্মভূমি মা
পূজা, আত্মবলি, ভালবাসা—দেশ ও আত্মসম্মানবোধ সমমর্যাদায় ভূষিত-
জননীর প্রতি একনিষ্ঠতা, প্রেম, ব্যাকুলতা, উদ্বিগ্নতা বলদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতিশোধ - বিশ্বের সৌহার্দ্যের জয় ঘোষণা—রা
রানী, বিসর্জন, গোড়ায়গলদ, চিরকুমার সভা, প্রায়শ্চিত্ত এবং বিশেষ ক
'তপতী'র মধ্যে ব্যক্তির ও সমাজের, আদর্শের ও বাস্তবের, প্রবৃত্তির নি
সংঘাত। 'রাজা ও রানী'তে প্রজাজনসাধারণের প্রতি রানীর সহানুভূতি, ভাল
স্নেহ, মমতা বিশ্বজননীত্ব তপতীতে 'আদর্শ বিহ্বলতা'—'বিসর্জনে'—কুসংস্
প্রতি নিন্দা, গ্লানি, গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, কর্ণকুন্তীসংবাদ, সতী
পরীক্ষা নামক কাব্য নাট্যগুলি নৈতিক আদর্শের প্রতীক। ফাল্গুনী, মুক্ত
রক্তকরবী হইতে তাসের দেশ পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অবৈষম্য, য
সভ্যতার ক্রূরদৃষ্টি—কী সমাজীয়, কী রাষ্ট্রীয় মানবিকতা বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষ্ঠান
কবি সহ্য করেন নাই। রাজা ও অচলায়তনে রূপের ভয়ংকর মূর্তি—সংস্
প্রয়োজনে। ফাল্গুনী নবজীবনের জয়গান। মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে রাষ্ট্রীয় নিপী
ও ধনী মুনাফালোভী মালিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী—মানবমু
বেদনা।

উপন্যাসে স্বদেশধর্ম

বঙ্কিম উপন্যাসে স্বদেশধর্ম স্বজাতীয় মনন, চিন্তন, ভাবনায় ছন্দিত। স্ব
মাতৃকার বাণীকার স্বদেশমন্ত্রের ব্রতে দীক্ষিত পূজারী। দেশকে মহৎ আদর্শে, ম
প্রাণে, মহৎ ধর্মে উত্তিষ্ঠিত করার দীক্ষায় মায়ের নিকট জন্ম হইতে বলি প্রদত্ত

স্বদেশ প্রেমরূপ বহ্নিতে আত্মোৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক পতঙ্গ। মায়ের অশ্রুভরা শ্রান্ত ম্লানমুখ, রুক্ষচুল, মলিনচিহ্ন বদন, শীর্ণকলেবর, অন্ন দাও চীৎকারের করুণ ক্রন্দনরতা পরাধীনতার রূপ তাঁহার মনের তারে ব্যথা বেদনার, অশ্রুবিগলিত সুরের মূর্ছনা তুলিয়াছে। 'মৃণালিনী'তে স্বদেশধর্ম স্পন্দিত বাংলা দেশ সম্বন্ধে বিদেশীর গ্লানিকর বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জেহাদ হিসাবে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বাংলা দেশ অধিকারের পিছনে যে হীনতা, নীচতা ও শঠতাপূর্ণ হিংসালু লোভী ষড়যন্ত্র ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার গোপনতথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন—দুষ্টমতি পাপিষ্ঠ পশুপতির চরিত্রে তাহার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' দেশপ্রেমের যে প্লাবন বহিয়াছে, তাহারই সেই প্রবলবন্যা বাহিত জলোচ্ছ্বাসের পূর্ববর্তী ইঙ্গিত 'মৃণালিনী'তে কলধ্বনিত। 'চন্দ্রশেখরের' মধ্যে দেশপ্রেমরূপ বহ্নিবন্যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ঝলকানি আছে। 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' মধ্যে সামাজিক, পারিবারিক নৈতিক আদর্শের মধ্যে দেশপ্রেমের আদর্শ গুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক জীবন ভিন্ন জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রথম সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিলেন। 'রাজসিংহে'র বিষয়বস্তু রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের কাহিনী—'আনন্দমঠে' 'বন্দে মাতরমের' বাণী ঘুমন্ত সিংহের জাগরণ অবস্থায় হুংকারের বাণী; জাতীয় রসে তাহা রসায়িত, সঞ্জীবিত, উদ্দীপিত— স্বদেশ প্রেমের জ্বালাময়ী বাণীরূপ উক্ত উপন্যাসের প্রতি ছত্রে ঝঙ্কৃত। স্বদেশের জন্য যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, যে সাধনা, যে বীর্য সাধন, যে নিষ্ঠা, যে উৎসর্গের প্রয়োজন আনন্দমঠ তাহারই উপন্যাস—তাঁহাদের জীবনের বীজমন্ত্র—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। 'দেবী চৌধুরানী'—মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের যুগমিলনে রচিত—তখন দেশোদ্ধারের জন্য যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন, তাহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' কর্মে অধিকার আছে, কিন্তু ফলভোগে অধিকার নাই—জনসেবায়, জনকল্যাণে জীবসেবায় ভগবানের পাদস্পর্শ পুণ্যের অধিকারী করে। মিল-এর হিতবাদ, কোঁতএর ধ্রুববাদের যুগপ্রেম সাধন হইয়াছে নিষ্কাম নীতিতে ও দেশপ্রীতিতে। 'সীতারাম' জাতীয় বিধিতে আত্মার আরাম—নৈতিকযোগসাধন 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' ইহা স্বাধীনতার স্বপ্ন রঙিন আবেশে মাধুর্যমণ্ডিত—আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার চৈতন্যস্বরূপ। হিন্দু শিল্প-কলা, সাহিত্য, কৃষ্টির প্রতি গাঢ় অনুরাগ, অকুণ্ঠ ভালবাসা। তাঁহার একএকটি উপন্যাস প্রীতিপ্রণয়ের মূর্তিময়ী প্রতিমা, সচ্চিদানন্দময়ী মূর্তি।

রমেশচন্দ্রের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' স্বদেশধর্মের তত্ত্বকাহিনী, উৎসাহ বাণী, 'জীবন প্রভাতে' শিবাজীর বীরত্ব, সেনানায়কত্ব, জাতি-

গঠনশীল যুদ্ধকৌশলের নৈপুণ্য অনুলিখিত—মোগলশক্তির বিরুদ্ধে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংগ্রাম, বিদ্বেষ, তাহার কূটকৌশল, ও স্বজাতীয় প্রেমনিষ্ঠা আমাদের মনে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়। শিবাজীর আদর্শচরিত্র ও রোমাঞ্চকর দুর্দম অভিযান নবপ্রাণোজ্জীবিত মহারাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিপুলকর্মোৎসাহ ও হৃদ্‌স্পন্দন আনিয়া দেয়। 'জীবনসন্ধ্যা'য় ইতিহাস প্রসিদ্ধ কীর্তিমান রাজপুত জাতির বিলীয়মান গৌরবের মৃত্যুউন্মুখ বেদনাঘন সকরুণ হাসির ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপুত জাতির বিধি নিষেধ, তাহাদের প্রভুভক্তির আদর্শ ও বিভিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে ঐক্য মনোভাবের দৃষ্টান্ত আমাদের মুগ্ধ করে। সমগ্র জনগণের মর্মজ বাণী ও বৈশিষ্ট্য, দেশ বৈরীর বিরুদ্ধে তাহাদের একতা, তাহাদের বন্ধুত্ব, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সৌভ্রাত্র্য নৈতিক আদর্শের পরিচয়—তীব্র অনুরাগের উজ্জ্বল সাক্ষী। জাতির জীবনীশক্তির শোণিত ধারা।

শরৎচন্দ্রে স্বদেশধর্ম সমাজ সংস্কার সাধনে পরিণত হইয়াছে। কপট সমাজবিদ্‌দের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপের জ্বালা—তাহাদের অন্ধচক্ষুতে দৃষ্টিদান করিয়া উপদেশ দান—সমাজের ভণ্ডামিতে আস্ফালন, সমাজগড়ার আদর্শ কি হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে সুষ্ঠু বিধিনির্দেশ দান—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। নারীজাতির মহিমা মহাদেবের ন্যায় পঞ্চমুখে গাহিয়াছেন। 'পথের দাবী'তে পরাধীন জাতির গ্লানিকর, লাঞ্ছনাময় মর্মন্তুদ কান্না ও বিপ্লবীমনের বিদ্রোহের অগ্নিময়ীরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদের রহস্যঘনতা ও বিপদ সংকটময়তার ভয়ালভীষণ রূপ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশপ্রেম ও লাঞ্ছিত জাতির স্বীয় আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে গোপন কূটনৈতিক রাজনীতির পর্যালোচনা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 'শেষপ্রশ্নে' নূতন জীবনাদর্শের পরীক্ষা নিরীক্ষা জাতীয় বৈপ্লবিক মতবাদের ঘোষণায় মুখর। 'পণ্ডিতমশাই'এ দেশসেবা প্রণয়ের গাঢ় আশ্লেষে সংমিশ্রিত হইয়া প্রেমকে অপেক্ষাকৃত অধঃস্তন পর্যায়ে টানিয়া আনিয়াছে।

কাব্য ও কবিতা

ঈশ্বর গুপ্ত যুগ সন্ধিক্ষণের কবি। মধ্য ও আধুনিক যুগের যুগ্মধারাটি তাঁহার রচনায় দৃষ্টিগোচর হয়। সমকালীন সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ঘটনার নিখুঁত ছবিতে চিন্তাশীল মননের পরিচয় মিলে। কাব্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে—সূক্ষ্মসমাজবোধ ও বাস্তব জীবনের সহিত আন্তরিক পরিচয়ের নিদর্শন মিলে, রঙ্গব্যঙ্গের ভাঁড়ামি, হাস্যরসের ঝলকানি মিলে—'তা ছাড়া বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা ও আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বিত গার্হস্থ্য জীবন ও ইহার কলহপরায়না স্থূল রুচি, রন্ধন ও ঢেঁকিশালার সুশ্রী পরিবেশে অধিষ্ঠিতা বঙ্গনারীর ব্যঙ্গচিত্র বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় শেষবারের মত

অঙ্কিত হইয়াছে।' সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের মতে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শেষ খাঁটী বাঙালী কবি'। তাঁহার খাঁটি বাঙালীয়ানার বিকাশ হইয়াছে বাংলা সমাজের এই সদাচঞ্চল কৌতুককর অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশের সংঘাতে। ইংরেজ ও ইঙ্গবঙ্গ সমাজে আমাদের চিরাচরিত সনাতন সমাজনীতি ও বিধিনিষেধের বিপর্যয় তাঁহার যে বিদ্রূপকারী মনোভাবকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহাই তিনি আমাদের দেশীয় ঘরোয়া জীবনের উচ্ছৃঙ্খলার উপর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মনোভঙ্গী ব্যঙ্গাত্মক বিদেশী প্রভাবের শূন্যতার দিকটাই লক্ষ্য করিয়াছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতা রুচিবিকৃতি ও হাসিঠাট্টা সমালোচনার তীক্ষ্ণ সূচিকায় বিদ্ধ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পদ্মিনী উপাখ্যান, শূরসুন্দরী ও কাঞ্চীকাবেরী—নূতন কাব্যধারার নিদর্শন। রাজপুত জাতির গৌরবময় ইতিহাস ও উড়িষ্যার বহুল প্রচারিত ধর্মমূলক উপকথা—শৌর্যদৃপ্ত বাক্‌নিদর্শনের প্রতিমূর্তি—ইহাতে দেশাত্ম-বোধের সুচারু বলিষ্ঠরূপ দান করা হইয়াছে। বিগতদিনের অতীত ভারতের কীর্তি মহিমা তাঁহার কাব্য প্রেরণার উৎসমুখ।

মধুসূদন—মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'এই প্রাচীনদেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। ···জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।'

রাজসঙ্গম

শ্রীরঞ্জনকুমার ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিধারার মিলনকে যদি শুধু সঙ্গম বলি তবে বঙ্গোপ-সাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের মহান মিলনকে রাজসঙ্গম বলতে পারি। সেই রাজসঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে আছি।

রাজধানী শহর ত্রিবান্দ্রম। আরব সাগরের উপকূলে কেরালার এই রাজধানীটি একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। ত্রিবান্দ্রমের স্থানীয় নাম তিরুবনন্তপুরম্। এই তিরুবনন্তপুরম্ থেকেই সরকারী Express বাস আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে দক্ষিণ মুখো। বিসর্পিত পথ এঁকে বেঁকে গিয়ে শেষ হয়েছে ভারতের দক্ষিণের প্রান্ততম বিন্দু কন্যাকুমারিকা তথা Cape Comorin-এ। এই Express বাস ছাড়া

সাধারণ বাসও আছে, ভাড়াও কম তবে নাগের কয়েলে বাস বদল করতে হবে। ছাড়া ট্যাক্সি পাবেন, ৫০ টাকা দিলে তারা সাগ্রহে আপনার যাওয়া আসার ভা নেবে। প্রবল বর্ষণের মধ্য দিয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। প্রায় ৫৪ মাঃ এর পথ ডানদিকে শুচীন্দ্রমের মন্দির পড়ল। এখানে শিবের একা থাকার কথা কিন্তু পার্বতী ও পুত্রকন্যা নিয়ে শিব সুখে ঘরসংসার করছেন দেখলুম। রাস্তার দুধারের পাহাড় শ্রেণী ক্রমশ নীচু হয়ে আসতে লাগল, মনে হল সমুদ্রের আর দেরী নেই।

নিজের অস্তিত্বটাকে খুবই হাস্যাস্পদ মনে হচ্ছিল যখন তিন সাগরের বালুবেলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার বাঁ দিকে বঙ্গোপসাগর, সামনে ভারত মহাসাগর আর ডানদিকে আরব সাগর। প্রবল তরঙ্গাঘাতে তটভূমিকে তটস্থ করে তুলছে এই তিন সাগর। দূরে আরব সাগরের বুকে সূর্যাস্ত হচ্ছে। সে এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। আমরা গান্ধী স্মৃতিসৌধের উপর থেকে সূর্যাস্তের মনোরম বর্ণচ্ছটা উপভোগ করতে লাগলুম। এই গান্ধী স্মৃতিসৌধটিই স্থলভাগের শেষ সীমানা। এর পর থেকে শুধুই জল। প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন এই সৌধটির অভ্যন্তরে একটি হল ও শ্বেতপাথরের একটি বেদী আছে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দু-তলা তিনতলার বারান্দায় উঠা যায়। এই বারান্দাগুলি থেকে সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে আরব সাগরের বুক রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। দিগন্তে মেঘ ছিল তাই আশানুরূপ সূর্যাস্ত দেখা গেল না। তবুও দর্শনার্থীরা মোটামুটি তৃপ্ত হয়েছেন। আশপাশের কলকাকলী থেমে গেছে। বিরাট বিশাল তিন সাগরকে আমি আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি, একা। অবিশ্রাম ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে যেন ভারতমাতার চরণ-বন্দনা করে যাচ্ছে। কবে এর শুরু কোথায় এর শেষ কিছুই জানি না।

চমক ভাঙলো দূরে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে। কন্যাকুমারী মাতার মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। উঠে পড়লুম সমুদ্রতীর থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম মন্দিরের দিকে। শিবের জন্য তপস্যা করে কন্যাকুমারী অবশেষে সফল হলেন। শিব বিয়েতে রাজী হলেন, বললেন লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিন্তু এ বিয়ে আর হবে না। ষাঁড়ের পিঠে চড়ে শিব যথাসময়ে চললেন কন্যাকুমারীকে বিয়ে করতে শুচীন্দ্রমের কাছে দুর্বাসার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় কিছু সময় অতিবাহিত হল। দুর্বাসার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে যেতেই পথে কাক ডেকে উঠলো। সত্যই সকাল হয়নি, এটা নারদের কারসাজি। ভালমানুষ শিব লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ভেবে শুচীন্দ্রমেই রয়ে গেলেন আর এখানে কন্যা চিরকালই কুমারী রয়ে গেলেন। বিরাট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মন্দিরটি সাধারণ জমির level থেকে বেশ কিছুটা নীচে। এখানে প্রবেশ করতে হলে ধুতি পরে, খালি গায়ে প্রবেশ করতে হয় শুচীন্দ্রমের মন্দিরের মত। মন্দিরের দরজার সামনে নানারকম পুঁথির মালা, ঝিনুক, রঙীন বালি প্রভৃতি বিক্রি করছে দেখলুম। মন্দিরে ঢুকেই প্রথমে

একটু অন্ধকার মত লাগল এবং কিছুটা ঘোরাঘুরি করে তবেই বিগ্রহের দর্শন পেলুম। কাছে যাবার নিয়ম নেই, দূর থেকেই ধূপ, প্রদীপ, বাস্তে কন্যাকুমারীকে দেখলুম। চন্দনচর্চিতা, কুমকুমরঞ্জিতা বালিকামূর্তি বসনেভূষণে অধিবাস তখন সম্পন্ন। শিবের আগমনের প্রতীক্ষায় দেবীর মোহিনীমূর্তি। দেবীর একটি অঙ্গাভরণ হীরের নোলক। সেটি থেকে প্রদীপের আলোয় এমনই দ্যুতি বেরোয়, যা দেখে অনেক জাহাজই Light house মনে করে ভুল পথে এসে দুর্ঘটনায় পড়ত। তাই দেবীর সামনের দিকের সমুদ্রমুখী দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি দেবীর বেশবাস ও মূর্তির দিকে—এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আধার। এই ভাবে সারা রাত ধরেই চলল দেবীর অপেক্ষা করার পালা। অবশেষে শিব যখন এলেনই না, সে কি ক্ষোভ। ছিঁড়ে ফেললেন গলার মালা আর ফুলের আভরণ, খুলে ফেললেন মহার্ঘ বসনভূষণ। নিরাবরণ, নিরালঙ্কার দেবীর সেই অরক্ষণীয়া কুমারী মূর্তি দেখি সকালের দর্শনে। শুনলুম দেবীমূর্তিটি নাকি কালো কষ্টিপাথরের, কিন্তু পুরু চন্দনপ্রলেপে ভারী সুন্দর একটা রং দেখা যায় দেবীর অঙ্গে।

আমরা যে রেস্ট হাউসে উঠেছি সেটি একেবারে সমুদ্রের উপর ও মন্দিরের গায়ে। এরকম অনেক রেস্ট হাউসই এখানে আছে এবং ভাড়াও moderate. তবে আগে থেকে চিঠি দিয়ে রাখলে ভাল ঘর পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে কেপ হোটেল। যারা নিজেদের আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চান তাদের পক্ষে এটি শ্রেষ্ঠ নিবাস। ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালুম। বাবা ও মা গেছেন মন্দিরে পুজো দিতে। মন্দিরের গা ঘেঁষে মাতৃতীর্থের রাস্তা নেমে গেছে সঙ্গমঘাট পর্যন্ত। অনেকেই এই সকালে স্নান করে পুজো সারবেন বলে ঘাটে ভিড় করেছেন। এদিকে পুবসাগর থেকে একটু একটু করে সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। বঙ্গোপসাগরের জলে আবীরের রং। ভারতবর্ষে এই বোধ হয় একমাত্র স্থান যেখান থেকে সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুইই দেখা যায়। ডানদিকে বিবেকানন্দ শিলা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই সেই শিলা যার উপরে বসে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। তীর ভূমি থেকে এর দূরত্ব একচতুর্থাংশ মাইল সমুদ্রের অভ্যন্তরে। এই পথটা বিবেকানন্দ সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন, আমরা পার হচ্ছি ডিঙি নৌকায় মাথাপিছু এক টাকা ভাড়া দিয়ে। সমুদ্র আজ অত্যন্ত অশান্ত। উত্তাল ঢেউগুলো ফুলে ফেঁপে তীরভূমির পাথরে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। এই প্রবল তরঙ্গদোলায় আমাদের নৌকার অবস্থা কাহিল। এক বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে অবশেষে আমরা বিবেকানন্দ শিলায় পৌঁছলুম। শিলার উপর থেকে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য তারিফ করার মত। Guide একটা কুণ্ড দেখালো যার থেকে মিষ্টি জল আসছে, অথচ চারদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা।

আশ্চর্য! এই শিলাতেই ভবিষ্যতে বিবেকানন্দের নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে ভারতের মূল ভূখণ্ড। আমরা যেন আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে দূর থেকে সনাতন ভারতকে দেখছি। সেই শাশ্বত, ঐতিহ্যময়ী ভারতমাতা যেন আমাদের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন আর বলছেন "ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।"

THe CIGAr AbSTAiner.

শ্রীভবেশচন্দ্র বসু

দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। ভাষাতত্ত্বকে নিয়ে খুব মুস্কিলে পড়েছিলাম। কলেজে অধ্যাপকরা বেশ ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অমূলক ভয় ঢুকে যাওয়ায় কিছুতেই ক্লাশে মনোযোগী হতে পারতাম না। সব সময় মনে হ'ত এই ভাষাতত্ত্বের জন্যই হয়তো শেষে অনার্স পাবো না। অনেক সাধ করে বাংলায় অনার্স নিয়েছিলাম। শেষে চলে যাবে!

এক সন্ধ্যায় ভাষাতত্ত্বের বই খুলে পড়ছিলাম। বাংলা ভাষার উৎপত্তি পড়তে গিয়ে দেখলাম যে পৃথিবীর বিভিন্ন আর্য গোত্রীয় ভাষাই এক আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে এসেছে। অত সব নাম ধাম মনের মধ্যে গুলিয়ে গেল। ভাবছি কি উপায়ে মনে রাখা যায়। এমন সময় আমার মামাতো দাদা এসে হাজির। তিনি আবার ইংরেজীতে এম. এ দিতে চলেছেন। তাঁকে আমার ভয়ের কথাটা বললাম। তিনি বললেন যে বাংলা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান তাঁর নেই, তবে এই ভাষার আগমনের ব্যাপার তাঁকে ইংরাজী ভাষাতত্ত্বেও পড়তে হয়েছে এবং তিনি তা পড়তে গিয়ে জেনেছিলেন যে এক আদি ভাষা থেকে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্য ভাষার উৎপত্তি নানা স্তর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। বাংলাও তার মধ্যে পড়ে।

তিনি তারপর বোঝাতে শুরু করলেন। বললেন যে আদি আর্য ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। সাধারণত এই উৎপত্তির তালিকাকে একটা ছকের সাহায্যে বোঝানো হয়ে থাকে।

আবার এইমূল ভাষার দুটিশাখা, 'শত' শব্দকে একটিতে বলা হত Centum,

আর একটিতে বলা হত Satem. তাই ভাষাগুলির কোনটা কেন্তুম বা Centum দলের কোনটা বা Satem 'শতম' দলের। দাদা বললেন যে এতবড়ো ছককে মনে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। তিনি এক ইংরেজী ভাষাতত্ত্বের পুস্তকে এই ছকের মূল ভাষাগুলিকে মনে রাখার জন্য একটা কথা পেয়েছিলেন। এবং আমাকে যখন সেটা বুঝিয়ে দিলেন তখন আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

কথাটা হ'ল THe CIGAr AbSTAiner. কথাটির মানে হ'ল যে সিগারেট খায় না। ইংরেজীতে কিছু লিখতে বসে এ ধরণের ফ্রেজ ব্যবহার আমরা করে থাকি। হয়তো লিখতে হবে 'সিগারেট খেও না।' তখন 'Don't be a smoker' না লিখে 'Be a cigar abstainer' লিখলে ভালো হয়। কিন্তু এই কথাটা দিয়ে যে ভাষাতত্ত্বের একটা অধ্যায় বোঝানো সহজ হয়ে পড়ে এ খবর অনেকেরই জানা নেই। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে 'THe CIGAr AbSTAiner' কথাটি। এর কতকগুলো অক্ষর বড়ো হাতের, আর কতকগুলো অক্ষর ছোট হাতের। বেশ মজার ব্যাপার। অক্ষরগুলো ইচ্ছেমত বড়োহাতের ছোট হাতের করা হয়নি। ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে এদের অনুরূপভাবে লেখা হয়েছে। আদি আর্যভাষা থেকে ইউরোপের ভাষার মূল ভাষাগুলির নামের আদ্যক্ষর কথাটির প্রতিটি অক্ষরে বর্তমান। এবার ব্যাখ্যা করা যাক।

যেমন 'THe' শব্দের 'T' দিয়ে তুখারীয় ভাষা এবং 'He' দিয়ে হিত্তী ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ দুটো ভাষাই অবলুপ্ত।

তারপর 'CIGAr' শব্দের 'C' দিয়ে কেল্‌তিক যার থেকে ওয়েল্‌স্ আইরিশ, ব্রেতন, গেলিক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। 'I' দিয়ে ইতালিক যার থেকে প্রথমে এসেছে লাতিন এবং লাতিন থেকে ফরাসী, ইতালীয়, স্পানীয়, পর্তুগীজ, রুমানীয় প্রভৃতি ভাষা জন্মলাভ করেছে। 'G' দিয়ে গ্রীক ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। 'Ar' দিয়ে আর্মানিক ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। আর্মানিক থেকে আর্মানী ভাষা জন্মলাভ করেছে।

এবার দেখা যাক 'AbSTAiner' কথাটি। 'Ab' দিয়ে আল্‌বানীয় ভাষার কথা বলা হয়েছে। আল্‌বানীয় থেকে এসেছে আল্‌বানী ভাষা। 'BS' দিয়ে শ্লাব-বাল্‌তিক কথা বলা হচ্ছে যার থেকে এসেছে রুশ, চেক, পোল, বুলগার, যুগ-শ্লাব, লিথুয়ণীয় এবং লেট ভাষা সমূহ। 'T' দিয়ে টিউটনিক ভাষার কথা বলা হয়ে থাকে। এই টিউটনিক ভাষা থেকে প্রথমে এসেছিল গথিক ভাষা। গথিক ভাষা আজ মৃত কিন্তু 'গথিক' শব্দটা বেঁচে আছে 'গথিক আর্ট' কথার মধ্যে। এই গথিক ভাষা থেকে এল ইংরেজী, জার্মান, ডাচ, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডিস ভাষা সমূহ। 'A' দিয়ে আর্যভাষার কথা বলা হ'ল। 'in' দিয়ে ইন্দো বা ভারতীয় আর্য এবং 'er' দিয়ে

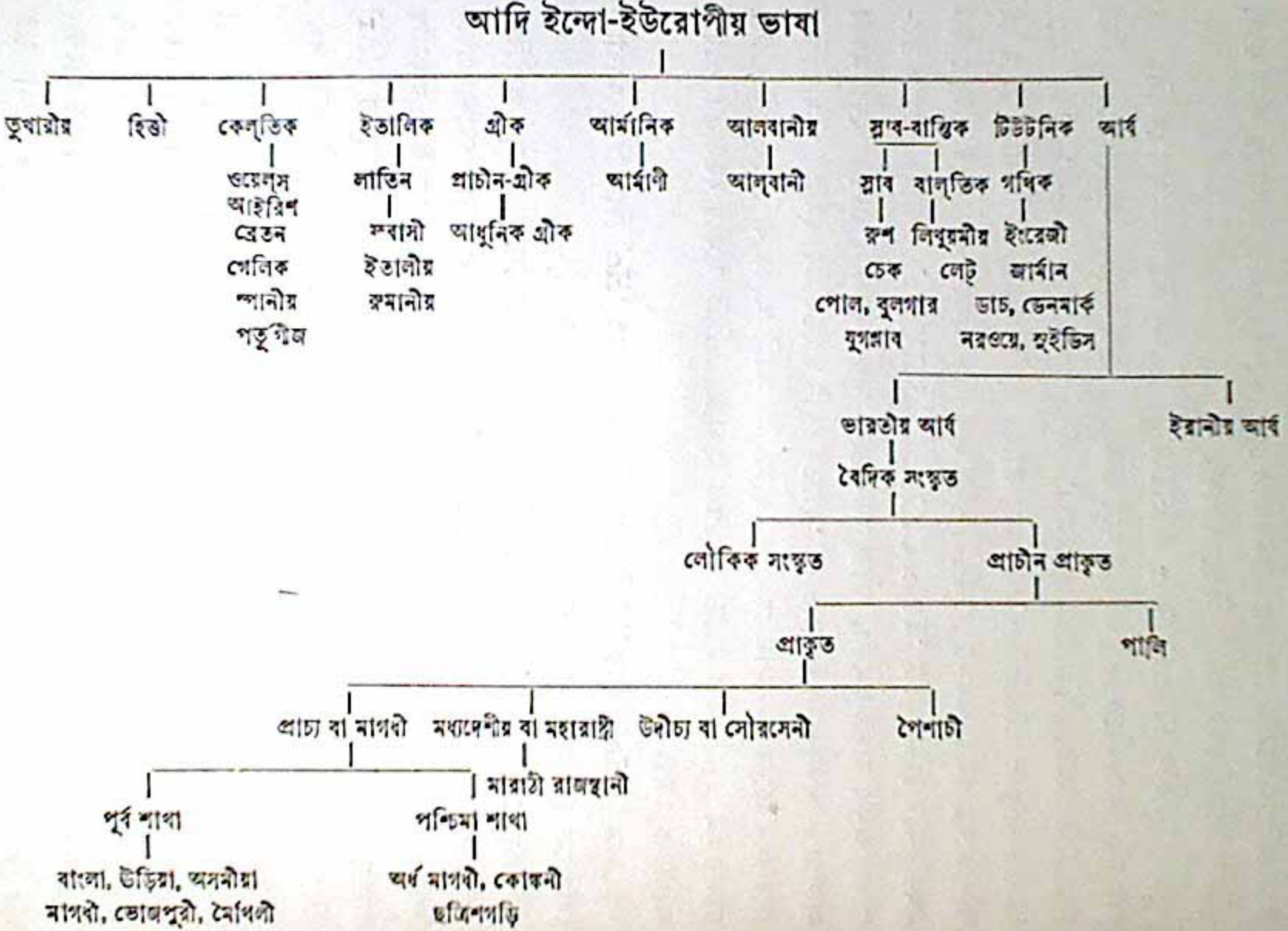
আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা
তুখারীয়
হিত্তী
কেল্‌তিক
ওয়েল্‌স
আইরিশ
ব্রেতন
গেলিক
স্পানীয়
পর্তুগীজ
ইতালিক
লাতিন
স্বাসী
ইতালীয়
রুমানীয়
গ্রীক
প্রাচীন-গ্রীক
আধুনিক গ্রীক
আর্মানিক
আর্মাণী
আলবানীয়
আল্‌বানী
স্লাব-বাল্‌তিক
স্লাব
রুশ
চেক
পোল, বুলগার
যুগস্লাব
বাল্‌তিক
লিথুয়ানীয়
লেট্‌
টিউটনিক
গথিক
ইংরেজী
জার্মান
ডাচ, ডেনমার্ক
নরওয়ে, সুইডিস
আর্য
ভারতীয় আর্য
ইরানীয় আর্য
বৈদিক সংস্কৃত
লৌকিক সংস্কৃত
প্রাচীন প্রাকৃত
প্রাকৃত
পালি
প্রাচ্য বা মাগধী
মধ্যদেশীয় বা মহারাষ্ট্রী
উদীচ্য বা সৌরসেনী
পৈশাচী
মারাঠী রাজস্থানী
পূর্ব শাখা
পশ্চিমা শাখা
বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া
মাগধী, ভোজপুরী, মৈথিলী
অর্ধ মাগধী, কোঙ্কনী
ছত্রিশগড়ি

ইরাণীয় আর্যভাষার কথা বলা হ'ল। ভারতীয় আর্য ও ইরাণীয় আর্যভাষা আর্যভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে।

তা'হলে এখন দেখা গেল যে আদি আর্যভাষা থেকে অন্যান্য ভাষার আগমন এই 'THe CIGAr AbSTAiner' কথাটির মাধ্যমে কত সহজে বোঝা যায়। মনে রাখার দিক থেকেও কথাটি খুবই সোজা। কেবল মনে রাখার মধ্যে একটু কায়দা করে মনে রাখতে হবে। কায়দাটা হচ্ছে অক্ষরগুলোর কোন্‌টা বড়ো হাতের আর কোন্‌টা ছোট হাতের তা মনে রাখা। অর্থাৎ 'T' বড়ো হাতের, 'H' বড়ো হাতের আবার 'e' ছোট হাতের হবে। তেমনি 'C' 'I' 'G' 'A' সবকটা বড়ো হাতের এবং 'r' ছোট হাতের হবে। 'A' বড়ো হাতের, 'S' 'T' 'A' সব বড়ো হাতের এবং 'b' 'in' ও 'er' ছোট হাতের হবে। অর্থাৎ 'He', 'Ar', 'Ab', 'in', 'er' এগুলোকে এক কথা ধরে নিতে হবে।

দাদা আমাকে আরও দেখালেন যে কথাটা দিয়ে ছকটাকেও ব্যাখ্যা করা যায়। কথাটা মনে থাকলে ছকটা আপনিই এসে পড়ে। পরীক্ষায় যদি প্রশ্নটা আসে তাহ'লে বুদ্ধি করে এগুলোকে ভালো নম্বর পাবার জন্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। কথাটা দিয়ে ছকটা আবার কি ভাবে করা যায় দেখি। 'আদি আর্য-ভাষা'র প্রতিশব্দ আমরা কিছু করিনি।

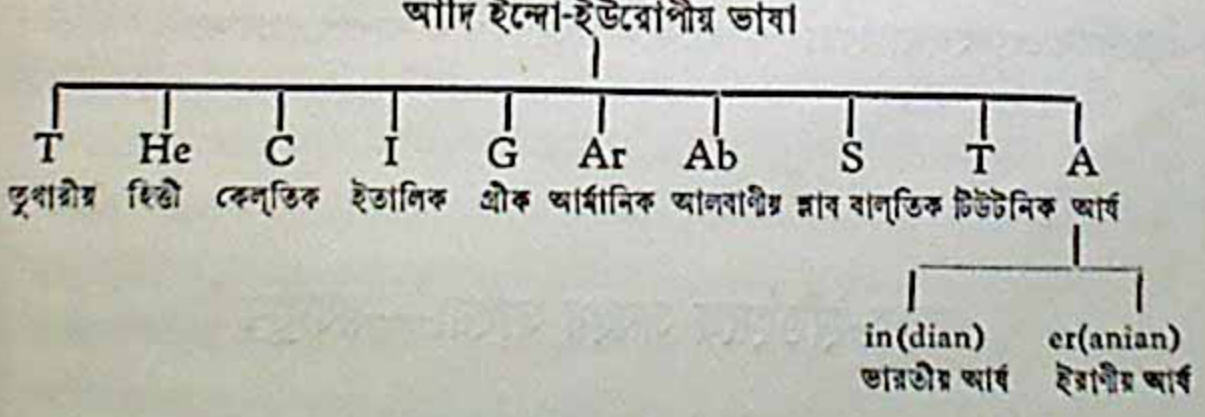

তাহলে পূর্বতন ছক আপনা হতেই মনে এসে যায়—তা দেখতে পাচ্ছি। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে "THe CIGAr AbSTAiner" কথাটা অত্যন্ত কাজের কথা। অথচ কথাটা এমন কিছু নয়।

সেদিন সন্ধেবেলায় ভাষাতত্ত্বের এই জিনিষটা আমার কাছে নতুন সন্ধানী আলো হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। ভাষাতত্ত্বের গোড়াতেই এটা পড়তে হয়। গোড়াতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তাই আর এগোতে পারছিলাম না। এখন চলার পথে আলো দেখা দিল। এগিয়ে যেতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে।

এমন অনেক জিনিষ আছে যা অকারণেই আমাদের ভয় ধরিয়ে দেয়। তার

ফলে সেটাকে এড়িয়ে চলে যেতে গিয়ে নিজেদের ক্ষতি করে ফেলি। কিন্তু ভয়ের বিষয়টাকে নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখব যে হয়তো সেটা তেমন ভীতিকর কিছুই নয়।

আমরা যারা ছাত্র তারা যদি একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পড়াশুনা করি তাহ'লে হয়তো এমনি হাজারো রকমের জিনিষ আবিষ্কার করতে পারবো।

বাড়িতে জ্যেঠা, কাকাদের মুখে শুনেছি যে ছেলেবেলায় তাঁরা যখন স্কুলে পড়তেন তখন ব্যাকরণের ণত্ব বিধান ষত্ব বিধান সহজে মনে রাখবার জন্যে পণ্ডিত-মশাইরা একটা শ্লোক শেখাতেন। আজকাল সে সব কায়দা চলে গেছে।

আমি যখন ক্লাশ সেভেনে পড়তাম তখন বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই সূর্যের সাতটা রঙকে বোঝাবার জন্যে 'ভিবজিওর' কথাটা আমাদের শিখিয়ে ছিলেন। এর প্রতিটি অক্ষর দিয়ে সূর্যের সাতটা রঙের নাম অনায়াসে বলে দেওয়া যায় এবং মনে রাখাও সহজ হয়।

তাই বলছি, কেবল ভাষাতত্ত্ব বা বিজ্ঞান নয়—শিক্ষার অনেক জটিল তত্ত্বই হয়তো এমন সহজে ব্যাখ্যাত হতে পারে। সেদিনের সন্ধ্যেবেলার ঘণ্টাতিনেকের আলোচনা আমার কাছে কেবল ভাষাতত্ত্বের একটা অধ্যায়কে সহজ কোরেই ক্ষান্ত হয়নি—এতদিনের যে ভয় সেটাকেও দূরীভূত করে ছেড়েছিল। শুধু তাই নয়, তারপর থেকে ভাষাতত্ত্বের গভীরে আরও যত এগোচ্ছি তত মনে হচ্ছে এত মজার এবং সরস বোধহয় সাহিত্যের আর কোন বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে না।

ভারত-ইতিহাসে সমন্বয় সাধনা—মধ্যযুগ

অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন

বিপরীতের সমন্বয় সাধন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। আর এই বিচারে ভারত-ইতিহাসের 'মধ্যযুগ' একটি সন্ধিক্ষণ। এ যুগের মূল লক্ষণীয় বিষয় বহিরাগত ইস্‌লামের সহিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সংঘাত ও সমন্বয়। 'শক হুন দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন' এই উক্তি নিছক কবি কল্পনা অথবা ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য কিনা তাহা বিচার্য বিষয়। প্রাচীন ভারতে বহিরাগত প্রভাবকে আত্মস্থ করিয়া ভারত সভ্যতার বিবর্তনের রূপটি স্বপ্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু 'মধ্যযুগে' এই সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা কতটা পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিয়াছিল

সে বিষয়ে বিভিন্ন মত বর্তমান। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিতরেই ভবিষ্যৎ ভারতের সুমহান সম্ভাবনা নির্ভরশীল একথা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু ভারতে ইস্‌লামের আগমনের ন্যূনাধিক আটশত বৎসর পরেও মিলনের প্রশ্নটি যে মর্মান্তিক-রূপে প্রকট হইয়া আছে তাহা কোন ইতিহাসরসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজিকার এই নিদারুণ পরিণতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই সমস্যার উৎসস্থল 'মধ্যযুগের' ইতিহাস বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের অপকৌশলের ফলেই এই বিভেদ রচিত হইয়াছে এইরূপ মত সরলিকৃত ইতিহাস, যথার্থ ইতিহাস নহে। একথা নিদারুণ সত্য যে 'শক হুন দল' একদেহে যেরূপে লীন হইয়াছিল, 'পাঠান-মোগল' সেইরূপ ভাবে একাত্ম হইয়া ভারত-সমাজে লীন হইতে পারে নাই। নিরপেক্ষ ইতিহাস বিচারে স্বীকার করিতে হইবে যে মধ্যযুগে ইস্‌লাম ধর্মের তীব্র উগ্রতা ও অন্য ধর্ম ও সমাজের প্রতি হৃদয়হীন অসহিষ্ণুতা এবং মধ্যযুগীয় জাতিভেদ ভিত্তিক হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতা—ভারত-ইতিহাসের সমন্বয় সাধনাকে ব্যাহত করিয়াছিল। ডাঃ মজুমদার হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের কারণ অনুসন্ধানে বলিয়াছেন—'These are primarily the religious bigotmy on the side of the Muslims and social bigotmy on the part of the Hindus. (Page XXXI—Struggle for the Empire)'

মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কের ইতিহাস সভাসদ অথবা রাজসভার সহিত যুক্ত ব্যক্তিগণের লিখিত বিবরণ (যেমন উদ্‌চী বা বারাণীর গ্রন্থ), সমসাময়িক পর্যটক (ইবন্ বতুতা) ও সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ (চৈতন্য চরিতামৃত বা চৈতন্য ভাগবত) ও মোগল আমলের ঐতিহাসিক গ্রন্থ (ফিরিস্তা লিখিত) ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া আলোচিত হইতে পারে। ঐতিহাসিক পানিককর অবশ্য সভাসদগণের লিখিত বিবরণগুলিকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচারে তেমন নির্ভরযোগ্য মনে করেন নাই, কারণ তাঁহার মতে এই সকল সভাসদগণ উগ্র ইস্‌লামপন্থী ছিলেন এবং তাঁহারা সুলতানদিগের কীর্তিকলাপ ইসলাম জগতে প্রচারের ও তাঁহাদের গুণ-কীর্তনের উদ্দেশ্যে হিন্দু-নিপীড়নের কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (See Page 127 Survey of Indian History)। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সভাসদগণের লিখিত বিবরণ নিরপেক্ষ পর্যটক ইবন্ বতুতা বা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ফিরিস্তার দ্বারা ও অপরাপর সমসাময়িক গ্রন্থে বহুল পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে এবং বর্ণিত ঘটনাগুলির সত্যতা অসত্যতা ব্যতিরেকে যে মনোভাবের প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত ইসলামধর্মের উগ্রতা ও হৃদয়হীন অসহিষ্ণুতার পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব সভাসদগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থগুলি অতিরঞ্জন দোষদুষ্ট অনির্ভরযোগ্য এইরূপ মত গ্রহণ সম্ভব নহে। উপাদানাবলীর গুণাগুণের তারতম্য

যাহাই হোক না কেন মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কের চিত্রটি অঙ্কিত করিতে হইলে সকল প্রকার উপাদানগুলির উপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত। নতুবা কেবলমাত্র কাল্পনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বা কোন একটি পূর্ব কল্পিত নীতি প্রয়োগের দ্বারা ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটন ব্যর্থ প্রচেষ্টার নামান্তর হইবে। এ বিষয়ে সুপণ্ডিত অধ্যাপক হাবিবের লিখিত Elliot and Dowsonর গ্রন্থের মুখবন্ধ (introduction) অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। Marx বর্ণিত 'অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য' (internal contradictions) নীতির প্রয়োগের দ্বারা ইতিহাস বিশ্লেষণ পূর্বপরিকল্পিত চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হইয়াছে, সত্য ইতিহাস আলোচনার অনুকূল হয় নাই। নিছক উপাদান ও তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচিত না হইলে ঔচিত্য বোধের' প্রভাবে অবাস্তব চিত্র অঙ্কনও সম্ভব এবং এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় Dr. K. M. Asrafর সুউদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্তির অবাস্তবতা লক্ষণীয় ("There was no cultural conflict between the Muslims and the Hindus. In fact the cultural forces were rapidly leading to a complete fusion between the two."—Life and Condition of the people of Hindustan.)

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের 'বিস্তার পদ্ধতি', স্বরূপ ও রাষ্ট্রাদর্শের আলোচনা অপরিহার্য। কারণ এইসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র রাজ্য জয়ই ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন ছিল ইসলামের আদর্শ। অ-ইস্‌লামীয় রাষ্ট্রকে (দার্-উলহার্‌ব্) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত (দার্-উল্-ইসলাম) করাই ছিল উদ্দেশ্য এবং সেহেতু পবিত্রগ্রন্থ কোরানের শ্লোকে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ সকল ব্যক্তির কর্তব্যরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে (জেহাদ ফি সবিল্ উল্লাহ্)। কোরাণে বিভিন্ন শ্লোকে ইহাও নির্দেশিত হইয়াছে (Quran IX, 5, 6, VIII P39-42) যে বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা, নতুবা হত্যা করাই শ্রেয় ('Make' war on them until idolatry is no more and Allah's religion reigne supreme' (Koran Penguin P 307)। ইসলাম ধর্ম অনুসারে সকল সক্ষম অধিবাসীগণ (জাহুদ) ধর্মযুদ্ধের সৈন্যরূপে গণ্য হইয়া থাকে এবং বিধর্মীর সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য কর্মরূপে নির্দেশিত হইয়াছে এবং এই কর্তব্যপালনে শৈথিল্য প্রকাশ (গফলৎ) 'পাপ' রূপে গণ্য হইয়াছে (See. Sarkar Hindustan Standard Puja Aunual 1951 Page 12)। মহম্মদ বিন্ কাশিম হইতে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত (কেবলমাত্র আকবর ব্যতিরেকে) সকল প্রধান প্রধান মুসলমান শাসনকর্তাগণ এই জেহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভারতে ইসলামের প্রসার করিতে

চাহিয়াছিলেন। ইসলামের আদর্শ অনুসারে অ-ইসলামীয় ধর্ম মাত্রই অসত্য এবং এই অসত্যের পূজারীগণ 'কাফের' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অ-ইসলামীয় রাষ্ট্রের পরাজিত অধিবাসীগণকে ক্রীতদাসরূপে গণ্য করা এবং কোরানের ভাষ্যকার সাফীর মতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অবশ্য কর্তব্য। একেশ্বরবাদী ইসলাম, সর্বেশ্বরবাদী পৌত্তলিক হিন্দু-ধর্মকে নির্মূল করিতে চাহিয়াছিল—সাফী ভাষ্য অনুসারে তাহাই ছিল ইসলামের কর্তব্য। একমাত্র হানাফী ভাষ্য অনুসারে অপমানকর 'জিজিয়া' কর প্রদানের মাধ্যমে পৌত্তলিকগণ জীবন ধারণের অনুমতি পাইয়াছিল—কোরানের অপরাপর ভাষ্যকারগণ তাহাও অনুমোদন করেন নাই। তুঘলকযুগের ঐতিহাসিক বারাণী সুলতান আলাউদ্দীনের সভাসদ কাজি মঘিসউদ্দীনের মাধ্যমে এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন ("No other religious authority except the great Imam Hanifa, whose faith we follow, has sanctioned the imposition of the gaziya on Hindus. According to all other theologians, the rule for the Hindus is, 'Either death or Islam." Tarikhi Firuz Shahi Page 290-291)। ইসলামীয় রাষ্ট্রে পরাজিত অ-মুসলমান অধিবাসীগণ 'জিম্মি' বা আশ্রিত অধিবাসীরূপে গণ্য হইত এবং প্রতি সুস্থ, সবল ও প্রাপ্তবয়স্ক 'জিম্মি'কে জিজিয়া কর প্রদান করিতে হইত। কাজি মঘিসউদ্দীন সুলতান আলাউদ্দীনকে জানাইয়াছিলেন যে জিম্মিগণ মূলত কর প্রদানকারী (খারাজ গুজার) এবং তাহাদের উচিত আদায়কারী রৌপ্য চাহিলে বিনীতভাবে স্বর্ণ প্রদান করা এবং বিনা প্রতিবাদে আদায়কারী নিক্ষেপিত ধুলি মুখব্যাদান পূর্বক গ্রহণ করা ("If the officer throws dirt into their mouths, they must without reluctance open their mouths wide to receive it.")। আবু ইউসুফ ইয়াকুব লিখিত 'কিতাব-উল্-খারাজ' গ্রন্থে অ-মুসলমানগণ ও শেখ হামদানি লিখিত 'জাকিরাৎ-উল্-মুলুখ" গ্রন্থে জিম্মিগণ কর্তৃক অবশ্য পালনীয় বিবিধ অপমানকর বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। মোগল রাজত্ব-কালেও (আকবরের রাজত্বকাল ব্যতিরেকে) হিন্দু-সংস্কৃতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু 'মেলা' ও উৎসবাদি রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অথচ ইসলাম ধর্মের পীর ও ফকিরগণের পবিত্রস্থানে মুসলমান সমাবেশ উৎসাহের সহিত পালিত হইত। হিন্দুগণ তীর্থকর প্রদান করিয়াই রেহাই পাইত না, মৃত ব্যক্তির অস্থি পবিত্রজলে নিক্ষেপ করিবার জন্যও তাহাদের কর প্রদান করিতে হইত (See Sarkar—Hindusthan Standard Puja Annual 1951, page 13)। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন যে ইসলামীয় রাষ্ট্রের মূল আদর্শ ছিল সকল অ-মুসলমানগণকে রাষ্ট্রের শত্রুরূপে গণ্য করা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে

তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা এবং এই আদর্শ অনুসারেই আফগানিস্থান, পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যে সকল অ-মুসলমানকে যথাসম্ভব নির্মূল করা হইয়াছিল (See—Hindusthan Standard Puja Aunual 1951 & History of Aurangzeb vol III Page 285)। ভারতে বিভিন্ন মুসলমান শাসনকর্তাগণ ইসলামের আদর্শ অনুসারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে বিধর্মী হিন্দুর রক্তে ইসলামের তরবারি পবিত্র করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদের হত্যালীলার বর্ণনা করিয়া উৎবী বলিয়াছেন যে বি-ধর্মীর রক্তের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণেই ছিল প্রাণ রক্ষার একমাত্র পথ। আলাউদ্দীন খল্‌জীর গুজরাট জয়ের বর্ণনায় তারিখ-ই-ওয়াসফ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমস্ত অঞ্চল বিধ্বস্ত করা, অসংখ্য অধিবাসীকে হত্যা করা এবং বহুনগর লুণ্ঠন, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস ও পদদলিত করা হইয়াছিল। অনুরূপ ভাবে ফিরোজ তুঘলক, সিকন্দর লোদী, আওরঙ্গজেব ইত্যাদি সম্রাটগণ ইসলামের আদর্শ অনুসারে ধর্মান্তরিত-করণ, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। এই প্রকার ধ্বংসলীলা ও অত্যাচারের চিত্র কেবলমাত্র সভাসদগণের লিখিত বিবরণ হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা নহে—বিদেশী পর্যটক ইবন্ বতুতার বর্ণনায়ও এই একই চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। মেবারের হিন্দুগণের উপর অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া বতুতা স্বীকার করিয়াছেন যে এই ধরনের অত্যাচার তিনি অপর কোথাও অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন নাই, ('This was a hideous thing which I have never seen being indulged in by any king')। চৈতন্যচরিতামৃত বা চৈতন্যভাগবতেও অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু সুলতান হুসেন শাহের আমলেও হিন্দুগণের মনে মুসলমান অত্যাচারের আশঙ্কার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিলেও কোন কোন দিল্লীর সুলতান ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু সাধক ও ধর্মাচার্যগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন। এমনকি ধর্মান্ধ সুলতান আলাউদ্দীন বা ফিরোজ তুঘলকও হিন্দু সাধক ও ধর্মাচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন (See—Survey of Indian History Page 127)। অবশ্য এই সকল শ্রদ্ধা প্রদর্শন ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই আরোপিত হইয়াছিল—হিন্দুধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের নীতি কোন ভাবেই ব্যাহত হয় নাই।

অর্থাৎ, সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া (আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫খৃঃ ব্যতিরেকে) মুসলমান শাসনকর্তাগণ আদর্শ ইস্‌লামীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় হিন্দুগণকে নানা-ভাবে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। সমগ্র তুর্ক আফগান যুগ ও মোঘল যুগে এই একই আদর্শ ও রীতি প্রচলিত ছিল। যথার্থ একমাত্র আকবরই ইসলাম ধর্মের উগ্রতা হইতে মুক্ত ছিলেন এবং দিল্লীর সম্রাটগণের ভিতর তিনিই প্রথম 'জিজিয়া' কর

উচ্ছেদ করিয়া (১৫৬৪) হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে কিছুটা সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, কারণ তাঁহার পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর বা সাজাহান যদিও 'জিজিয়া' কর পুনরায় আরোপ করেন নাই, তথাপি ধর্মক্ষেত্রে সহনশীলতার আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আচার্য যদুনাথের মন্তব্য স্মরণীয়—It should never be forgotten that according to Muslim theory of state, in a Dar-ul-Islam repression of non-Conformists in religion was the normal rule and toleration could be only an exception or rather a neglect of duty on the part of the government" (See Hindusthan Standard Puja Annual 1951 Page 12)। পরবর্তী সম্রাট আওরঙ্গজেব পুনরায় ভারতকে সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং অত্যাচারের উগ্র নীতির দ্বারা তাঁহার শাসনকালকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের হিন্দু নিপীড়ন নীতি সমর্থন করিয়া শ্রীজাহিরউদ্দীন ফারুকী তাঁহার পুস্তক Aurangzeb and his Times গ্রন্থে উক্তি করিয়াছেন যে আওরঙ্গজেব হিন্দুদের বিরোধিতা করেন নাই, হিন্দুগণই বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। হিন্দু-সেনাপতিগণের সমর্থনে আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব 'দার-উল্-ইসলাম' প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সকল হিন্দু নৃপতির সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতি ও হিন্দু ধর্মের প্রতি সহনশীলতার আদর্শের দ্বারা আকবর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যে সমন্বয় সাধনের সুমহান প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ-শাসন কালে (১৬৫৮-১৭০৭) হিন্দু-নিপীড়নের নিষ্করুণ অধ্যায়ে তাহার পূর্ণ সমাধি ঘটে। সর্বক্ষেত্রে সমন্বয়ের আশা নিরন্তর ব্যবধানে সমাধি লাভ করে। এ বিচারে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল জাতীয় জীবনের দুর্যোগপূর্ণ নিষ্ফল অধ্যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীবাস্তব যে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য—("It is a pity that Indianisation of the Mughuls and other races from central Asia who made India their home and of the institutions which they brought with them, was interrupted in the reign of Shahjahan and altogether stopped by Aurangzeb with the result that the forces of reaction of the sultanate period reasserted themselves and submerged those of nationalism. It is idle to speculate as to what course Indian history would have followed if Aurangzeb had not

appeared on the scene and attempted to convert India into Islamic country." (See Preface-Mughal Empire)।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'জেহাদ' ও ধর্মান্তরিত করণের নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ও সমাজ কিভাবে রক্ষা পাইল? অধ্যাপক হাবিবের মতে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তরিত করা হয় নাই, বিশেষ ভাবে সহরাঞ্চলে এবং সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমান সমাজের জাতিভেদমুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাহাদের সমর্থনে মুসলমান শক্তি দ্রুতগতিতে প্রসার লাভে সমর্থ হয় ("It is useless to talk of force with reference to the conversion of city workers of the thirteen century. A few may have adopted the new faith through connection ; others may have been tempted. But what we find mostly is the conversion of groups."..... Elliot and Dowson Vol-II P. 56. —"Indian city labours both Hindu and Muslim, helped to establish the new regime and also maintained it, through all revolutions and revolts, for over five hundred years"—Elliot and Dowson Vol II P. 50)। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ যদি স্বেচ্ছামূলক হইত এবং হিন্দুগণ যদি জাতিভেদের কঠোরতায় বীতশ্রদ্ধ হইত তাহা হইলে মুসলমান শাসনের কেন্দ্রভূমিতে জনসংখ্যার স্বল্পতা কিরূপে সম্ভব হইল? ইসলামের ন্যায় বিদ্বেষের নীতির দ্বারা পরিচালিত ('হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নতুবা মৃত্যু') কোন ধর্মের পক্ষে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার উল্লেখ নিতান্ত প্রহসনের বিষয়বস্তু, ইতিহাসের কঠোর বিচারে এই মতের কোন স্থান নাই। ইসলামীয় রাষ্ট্রে 'জিম্মি'রূপে অপমানকর 'জিজিয়া' কর প্রদান করিয়াও বিপুল সংখ্যক ভারতীয়গণ যে হিন্দুধর্ম বর্জন করে নাই এবং নিম্ন ও উচ্চবর্ণের সকল হিন্দুই যে হিন্দুধর্মে আস্থা রাখিতে পারিয়াছিল, তাহা হিন্দুধর্মের নিজস্ব আত্মিক শক্তির প্রকাশ— ইসলামধর্মের সহনশীলতার জন্য নহে। আফগানিস্থান, পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যে সকল অ-ইসলামীয় সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করিতে ইসলাম দ্বিধা করে নাই, সুতরাং সেই প্রচেষ্টা যে ভারতে প্রযুক্ত হয় নাই এইরূপ অনুমান (বিশেষতঃ সভাসদগণের বিপরীত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও) করিবার কোন কারণ নাই। হিন্দুধর্ম ও সমাজের নিজস্ব শক্তি ব্যতিরেকে বাস্তবক্ষেত্রে সকল হিন্দু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ অথবা ধর্মান্তরিত করা সহজ ছিল না। বিপুল দেশ ভারতবর্ষ ও তাহার বিপুল জনসংখ্যাই ইহার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ইহা ব্যতিরেকে শাসন-ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবাগত ইসলামকে নিম্নবিত্ত হিন্দু কর্মচারী ও সওদাগর-

শ্রেণীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষিকর্মের জন্য ইসলামীয় রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং এই সকল বাস্তব অসুবিধা ও হিন্দু সমাজের দৃঢ় প্রত্যয় ভারতকে আফগানিস্থানে বা পারস্যে পরিণত করে নাই। ইহাও স্বীকার্য যে মোঘল আমলের ব্যাপকাংশে (আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ব্যতিরেকে) ইসলামীয় রাষ্ট্রাদর্শের তীব্র উগ্রতা বহুলাংশে স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। ইহাও অনুমেয় যে হিন্দুধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবে সমাজ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিন্দু বিদ্বেষ হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত ছিল এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ধর্মান্তকরণ-স্পৃহা কিছু পরিমাণে পরিত্যক্ত হইতে থাকে যদিও শক্তির দ্বারা ধর্মান্তরিত করার নীতি হইতে ইসলাম কোন সময়েই মুক্ত হইতে পারে নাই। Divide and Quit গ্রন্থে ইংরাজ লেখক Penderel Moon ১৯৪৭ সালের কুখ্যাত পাঞ্জাব হত্যালীলার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাওয়ালপুর রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের হিন্দুদিগকে কিভাবে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ধর্মান্তরিত হিন্দুগণকে পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হয় নাই কেন? ইহা কি কেবলমাত্র হিন্দুসমাজে সঙ্কীর্ণতারই দৃষ্টান্ত? এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'শরিয়ৎ' অনুসারে দীক্ষিত মুসলমানকে 'শুদ্ধি' আচারের দ্বারা পুনরায় পূর্বধর্মে ফিরাইয়া আনার প্রচেষ্টা 'আইন' অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল। এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পর্যটক মানুচি লিখিয়াছেন যে ইসলামধর্ম ত্যাগী ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত কর্মরূপে গণ্য হইত (See—Sarkar-Hindusthan Standard Puja Annual 1951 Page 13)

ইসলামীয় রাষ্ট্রের উগ্র ও সংকীর্ণ আদর্শের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধন যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নিম্নস্তরে সামাজিক ক্ষেত্রে গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থায় ও মোগল আমলে উচ্চশ্রেণীর ভিতর সমন্বয়ের একটি ভিত্তি রচিত হইয়াছিল, যদিও তাহা তেমন সুগভীর ও একাত্ম হইয়া উঠিতে পারে নাই। অ-মুসলমানদের প্রতি হীন 'কাফের' দৃষ্টিভঙ্গী যেমন মুসলমান সমাজকে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক করিয়াছিল তেমনি সঙ্কীর্ণ 'ম্লেচ্ছ' দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা হিন্দু সমাজও যথার্থ সমন্বয় সাধনায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করিয়া একাদশ শতাব্দীর মুসলমান পণ্ডিত আলবেরুণী বলিয়াছেন, "They (the Hindus) despised the Muslims and called them mlecchas or impure persons and forbade having any connection with them, be it's intermarriage or any other kind of relationship, because they thought

that by doing so they would be polluted." (Alberuni's India P19-20)। এইরূপ পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্বেও হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা ইসলাম ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এবং ইহার ফলে ভারতীয় মুসলমানগণের বিবাহ ও ধর্মীয় রীতিনীতি অভারতীয় মুসলমান সমাজ ও রীতিনীতির সহিত অনেকাংশে পৃথক হইয়া উঠিতে থাকে। ইসলাম ধর্মে সুফীবাদ ও হিন্দু সমাজে মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পরস্পরের প্রভাবের ফলস্বরূপ এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ভক্তি তত্ব মূলত গীতা হইতেই আহৃত এবং একেশ্বরবাদ মূল উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছিল। ইসলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে হয় নাই (...the fundamental doctrines of the medieval saints, including Bhakti in the shape of an intense love for, and a belief in, one God, have been deep rooted ideas on Indian soil, and nothing but strongest positive evidence should incline one to accept the view that the medieval saints were indebted to Christianity and Islam or any other source." (Majumder. Delhi sultanate Page 552) ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভক্তি আন্দোলন বা সুফী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিন্দু বা মুসলমান সমাজকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই এবং উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী সঙ্কীর্ণ প্রাচীনপন্থী সমাজ ব্যবস্থার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক সমন্বয়ের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই সীমাবদ্ধ থাকে সুপরিস্ফুট কুসুমে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

সুলতানগণের তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ নীতির ফলে শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তুঘলক আমলের শেষ পর্যন্ত (১৪১৪) হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্য পদ্ধতির কোন প্রাণবন্ত মিলন সম্ভব হয় নাই। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষাংশ হইতে স্বাধীন প্রদেশ-গুলিতে প্রাদেশিক শিল্পের বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং এই সকল প্রাদেশিক শিল্পে হিন্দু-মুসলমান পদ্ধতির মিলন প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাও লক্ষণীয় যে সুলতানি শাসনে মুসলমান আধিপত্য-অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত স্বাধীন হিন্দু-অঞ্চলে হিন্দু ও জৈন স্থাপত্য (বিশেষ করিয়া মন্দির নির্মাণ শিল্প) আপন শিল্প সুষমায় অপূর্বরূপ ধারণ করিয়াছিল (যেমন খাজুরাহো, আবু পাহাড় ও কোনারকের মন্দির)। সুলতানি আমলে হিন্দু-বিদ্বেষ নীতির ফলে প্রত্যক্ষ সুলতানি-শাসনাঞ্চলে হিন্দু-স্থাপত্যের কোন উৎকর্ষ সম্ভব হয় নাই এবং বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই বিধ্বংসীনীতির বর্ণনা করিয়া কুতুবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামী

বলিয়াছেন যে বিজয়ীগণ দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সহরাঞ্চলের মূর্তি ও মূর্তিপূজার স্থানগুলি মুক্ত করে এবং তথায় মসজিদগুলি স্থাপনা করে (Hasan Nizami—Elliot and Dowson vol II)।

মোঘল যুগে আকবরই প্রথম হিন্দু পারসীয় স্থাপত্য শিল্প রীতির সুষ্ঠু মিলন সাধন করিয়া এক নূতন জাতীয় শিল্প রীতির প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালে তাহা এক সুমহান জাতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে আকবরের উদার সহৃদয়তা ও হিন্দু-শিল্পীগণের অবদান জাতীয় সমন্বয়ের একটি শ্রেষ্ঠ সোপান রচনা করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব শিল্পরচনার ক্ষেত্রে নূতন কোন অবদানের প্রচেষ্টা করেন নাই—বরং ইসলামের নীতি অনুসারে সৌধগুলিকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহাই হোক শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে স্থাপত্য শিল্পগুলি (হিন্দু মন্দির ব্যতিরেকে) অক্ষয় থাকিয়া যায় ও আকবরের প্রচলিত ভারতীয় পারস্য নীতির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হয়।

মধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় প্রসঙ্গ আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সমগ্র সুলতানি শাসন কালে উগ্র ইসলামীয় নীতি পরিচালিত হইবার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজে সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব হয় নাই এবং তাহার মূল কারণ ইসলামীয় রাষ্ট্রের মূলনীতি। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে সুলতানি যুগে সমগ্র ভারতে সুলতানি শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং আলাউদ্দীন ও মহম্মদ তুঘলকের শাসন (প্রথমার্ধ) ব্যতিরেকে সুলতানি সাম্রাজ্য সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের রূপ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ধর্ম-ভিত্তিক ইসলামীয় রাষ্ট্রের নীতি সম্পূর্ণরূপে বিশাল ভারতকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে ভারতীয় মুসলমানগণের বিপুল অংশ মূলতঃ ধর্মান্তরিত হিন্দু (see page 615, Struggle for the Empire)। সুতরাং হিন্দু সমাজের প্রতি ধর্মান্তরিত মুসলমানগণের উগ্রতা সাধারণভাবে তেমন তীব্র আকারে প্রকাশ পায় নাই। গ্রামপ্রধান বিশাল ভারতে সাধারণ কৃষক ও মজুর ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রের উগ্রতা হইতে মুক্ত ছিল—সুতরাং ভারতবাসীর স্বাভাবিক সহনশীলতা উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর পৃথক বা দ্বিজাতীয় মনোভাব রচিত হইতে দেয় নাই। দীর্ঘকাল পরস্পরের সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে ধর্মান্তরিত হিন্দু ও সাধারণ হিন্দুর ভিতর প্রতিবেশীসুলভ সহৃদয়তা রচিত হইয়াছিল। হিন্দু নিপীড়নের উদ্দেশ্যের দ্বারা শাসন যন্ত্র পরিচালিত হইলেও তাহার প্রভাব সর্বত্রগামী হইতে পারে নাই। সাধারণ শ্রেণীর ধর্মান্তরিত মুসলমান গ্রামবাসীগণ—স্থানীয় হিন্দু বিশ্বাস ও আচার পালন করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই অ-ইসলামীয় পূজা পদ্ধতি গ্রহণ করিত। যেমন পয়গম্বরের পবিত্র পদচিহ্ন (কদমে-রসুল) পূজা, হিন্দুদের বিষ্ণুপদ পূজার দ্বারা

প্রভাবিত হইয়াছিল। মোঘলযুগে আকবরের নীতি এই সহনশীলতার পরিবেশেরই প্রতিফলন স্বরূপ। কিন্তু আকবরের বংশধরগণ তাঁহার নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজেব পুনরায় দার-উল্-হার্‌ব এর পরিবর্তে দার-উল্-ইসলাম নীতি গ্রহণ করায় সমন্বয়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। উদার ও সহনশীল দারার ব্যর্থতা ও তাঁহার বিরুদ্ধে মুসলমান অভিজাতগণের বিরূপতা সম্পূর্ণ সমন্বয়ের শেষ সম্ভাবনাটিকে বিলুপ্ত করে। ভারতে বিশাল উপজাতি সম্প্রদায় যেমন পৃথক সত্তারূপে ভারত সমাজে অবস্থান করিতেছিল, তেমনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ও পৃথক দুইটি সম্প্রদায়রূপে বর্ধিত হইতে থাকে এবং এই পার্থক্য পৃথক দুই সম্প্রদায়ের সহ-অবস্থান-রূপে গণ্য হইতে পারে, দুইটি জাতির পৃথক অবস্থানরূপে নহে। ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানগণ ভাষা সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে পূর্ণ ভারতীয়, আরবীয় বা পারস্যদেশীয় নহে।

প্র তি বে দ ন

ছাত্রসংসদ

কলেজের ছাত্রবন্ধুরা যেদিন আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন, সেদিন জানতাম না যে আমার সামনে এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার অধ্যায় এগিয়ে আসছে। আজ কলেজীয় জীবনের সায়াহ্নে এসে সেই অভিজ্ঞতাগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা কি করতে পেরেছি আর কি করতে পারিনি তা বিচারের ভার ছাত্র বন্ধুদের উপরেই ছেড়ে দিয়ে আমরা কি করতে চেয়েছি তাকেই এখানে প্রাধান্য দিতে চাই।

নতুন বছরে প্রতিবারের মত এবারেও আমরা এক স্বাগত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবাগত ছাত্রবন্ধুদের অভিনন্দন জানাই।

আশুতোষ, যোগমায়াদেবী ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সম্মিলিতভাবে এবারেও আমরা ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মোৎসব, ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস ও সাড়ম্বরে বাণী অর্চনার আয়োজন করি।

রবীন্দ্র পাঠচক্র, বায়োলজিক্যাল সেমিনারকে আমরা একশত টাকা করে অর্থ সাহায্য দিয়েছি। যদিও এ সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য, কিন্তু নানা বাস্তব অসুবিধার জন্য আরো বেশী দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা ১৯৬৫ : সম্পাদকমণ্ডলী

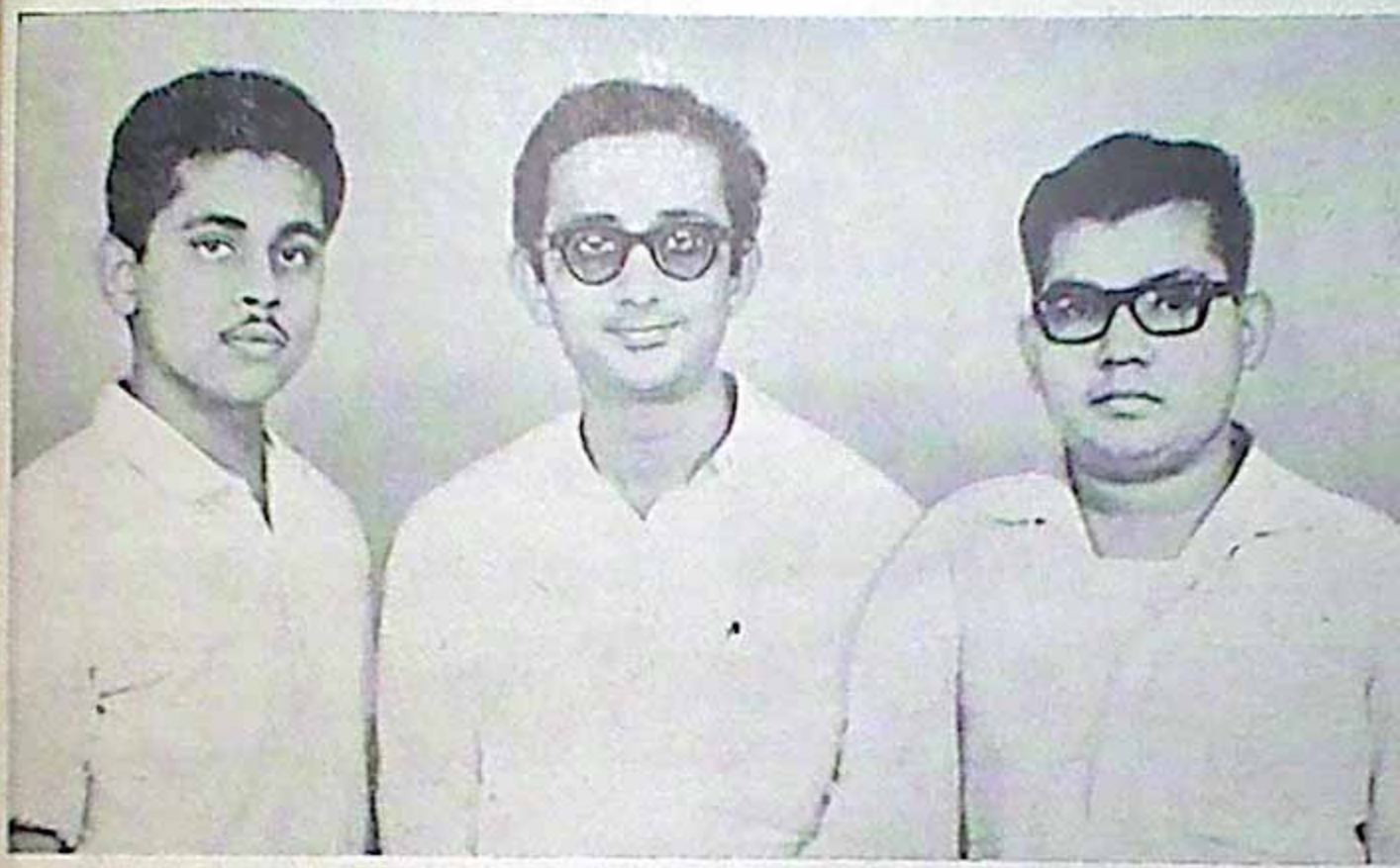

সত্যব্রত সান্যাল, অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পত্রিকাধ্যক্ষ), ভবেশচন্দ্র বসু

J. U. O. Pradip Majumdar
epresented W. B. on Republic day Parade
this year at Delhi.

J. U. O. Jayanta Sen
Represented W. B. on Republic day Parad
held in 1966 at Delhi.

Sitting (*L to R*)—A/o. A. N. Banerjee ; A/o. P. K. Roy ; Div Surgeon ; P. K. Ghosh ; Vice Principal N. K. Bhattacherjee ; Principal K. N. Sen ; Staff officer. N. R. Sarker ; Dist officer S. Bose ; Div Supdt. A. R. Datta.

Standing 1st Row (L to R)—Sgt. D. Saha ; Pte. S. K. Chatterjee ; Cpl. J. Singh ; Cpl. D. Marik ; Pte. S. Chowdhury ; Pte T. K. Chatterjee ;

প্রতিবেদন

আমাদের কলেজের শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্রবন্ধুই আসেন এমন এক শ্রেণী থেকে যে শ্রেণী আজ হাজার হাজার সমস্যায় জর্জরিত। তাই আমরা 'ছাত্রসংসদের' ভিতরের ও বাইরের সমস্ত কাজকেই ছাত্রকল্যাণমূলক কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছি।

আমাদের 'চীপ ষ্টোরের' অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রবন্ধুরা যাতে আরো সস্তায় খাতাপত্র, বই ইত্যাদি পেতে পারেন তার জন্য ছাত্রসংসদ সবসময়েই সচেষ্ট।

ছাত্র সংসদের তীব্র আর্থিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও আমরা Aid-Fund থেকে দরিদ্র ছাত্রবন্ধুদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছি। কিন্তু এ সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। আগামী বছরে একটা Charity Film Show করে Aid Fund-এর তহবিল কিছু বাড়ানো যায় কিনা নবাগত ছাত্রসংসদকে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রবন্ধুদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করেছি। সাপ্তাহিক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে ছাত্রবন্ধুরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্রবন্ধুদের স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে তুলতে এই সব আলোচনাচক্রের হয়তো কিছুটা অবদান থাকবে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং Indoor games (কমনরুম) প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যমে। কলেজের ছাত্রবন্ধুরাই এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে এবং অংশ গ্রহণ করে।

ছাত্রসংসদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কলেজের 'চীপ-ক্যান্টিনের' সমস্ত অভিযোগ দূর করা সম্ভব হয়নি। আশুতোষ, যোগমায়াদেবী এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তিন বিভাগের চীপ ক্যান্টিনের পরিচালনার দায়িত্বভার যদি একই পরিচালকের হাতে দেওয়া হয় তবেই আরো অনেক সস্তায় ভাল খাবার পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এ-বিষয়ে তিন বিভাগের কলেজ কর্তৃপক্ষকে রাজী করান সম্ভব হয়নি। ছাত্রবন্ধুদের সুবিধের জন্য চীপ-ক্যান্টিনকে চারতলা থেকে নীচে নামাবার জন্যও ছাত্র-সংসদ কর্তৃপক্ষকে দাবী জানিয়েছে।

আজ আমাদের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায় যখন ঘুণ ধরেছে, ভবিষ্যতের চিন্তাহীন হতাশাগ্রস্ত ছাত্র-যুবসমাজ যখন বিপথগামী, অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, কালো-বাজারীর একতরফা ঘটনাবলী যখন সমস্ত সমাজকে নিয়ে চলেছে এক চরম সর্বনাশের পথে, তখন ছাত্রসংসদগুলোর দায়িত্ব ও কর্মপন্থা নিয়ে নোতুন করে চিন্তার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে আজ ছাত্রদের তেল, চাল, মাছের জন্য লাইন দিতে হয়, শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য টিউশনি বা চাকরির সন্ধান করতে হয়, সেখানে 'ছাত্রানাং অধ্যয়নম্ তপঃ' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ছাত্র-

যুবসমাজের মধ্যে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মান ক্রমশঃ উন্নত করা আজ ছাত্রসংসদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে উপস্থিত। ছাত্র-যুবসমাজের মধ্যে স্বাধীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়।

আমাদের ছাত্রসংসদ তাই কলেজের আভ্যন্তরীন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সমস্যা নিয়েও চিন্তা করেছে। আমরা সরকারী শিক্ষা-সঙ্কোচন নীতির তীব্র বিরোধিতা করি। সকল ছাত্রের ভর্তির সুযোগের দাবীসহ অন্যান্য দাবী নিয়ে উপাচার্য মহাশয়ের কাছে এক ছাত্র ডেপুটেশন প্রেরণ করি, জাতীয় সরকারের সহযোগিতায় বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবকে আমরা তীব্র নিন্দা করি এবং ছাত্র-সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করি।

আগামী ছাত্র সংসদকে সুস্থ, সুন্দর শিক্ষাজীবনের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলার অনুরোধ করছি।

ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংসদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা ও উপদেশ পাওয়ার জন্য অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন, উপাধ্যক্ষ নীরোদকুমার ভট্টাচার্য এবং সংসদ সভাপতি শিশিরকুমার দাসকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বরুণ গাঙ্গুলী
সাধারণ সম্পাদক

রবীন্দ্র পাঠচক্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একদা যে রবীন্দ্র পাঠচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল আজ তা' বত্রিশ বছরে পা দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুদীর্ঘ দিনের এই সাহিত্য সংস্থা সম্বন্ধে কলেজের বহু ছাত্র বন্ধুই উদাসীন। তাঁরা মনে করেন যে কেবলমাত্র সাম্মানিক বাংলার ছাত্ররাই এর সভ্য হবার অধিকারী। তাই বাধ্য হয়ে এই কথাটা সকল ছাত্রবন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে রবীন্দ্রপাঠচক্র সাহিত্য-বিজ্ঞান নির্বিশেষে সাহিত্যানুরাগী প্রতিটি ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত। আমরা তাই এই সাহিত্য-সংস্থাকে আরও উন্নত করে তোলার জন্যে সকল ছাত্রবন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করি।

রবীন্দ্র পাঠচক্রের মুখপত্র 'লিপিকা'র মাত্র দুটি সংখ্যা এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। নানাবিধ অসুবিধার জন্য লিপিকার অন্যান্য সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে দুটি প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য লিপিকার যুগ্ম-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীঅরূপরতন

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীভবেশচন্দ্র বসুর প্রয়াস প্রশংসনীয়। একথা ঠিক যে বিবিধ গোলযোগের দরুণ পাঠচক্রের কয়েকটি নির্ধারিত সভানুষ্ঠানের আয়োজন বিঘ্নিত হয়েছে ও কয়েকটি অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এর মধ্যেও আমরা কয়েকটি সভানুষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন করেছি।

গত ২৬শে জুলাই রজনীকান্ত শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি ঘরোয়া সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়। এটাই আমাদের প্রথম সাহিত্যানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীনীরোদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়। এরপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সলিল গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১১ই আগষ্ট।

'দুর্গেশনন্দিনী' শতবার্ষিকী উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে আমরা একটি বড় সাহিত্য সভার আয়োজন করি গত ১৬ই নভেম্বর। এই দিনের সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় ও অধ্যাপক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

পাঠচক্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য অনুষ্ঠান হ'ল তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য প্রতিযোগিতা। অন্যান্য বারের মত এবারেও এই প্রতিযোগিতা আশুতোষ, যোগমায়া ও শ্যামাপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দ্বারা সম্মানিত হন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হ'ল।

ছোটগল্প—

প্রথম পুরস্কার—ত্রিদিবকুমার বসু : আশুতোষ মহাবিদ্যালয়।
দ্বিতীয় পুরস্কার—ভগীরথ মিশ্র : ঐ
তৃতীয় পুরস্কার—সুমিত্র রায় : ঐ
বিচারক : অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

প্রবন্ধ—(বিষয় : বাংলা সাহিত্যে স্বদেশধর্ম)
প্রথম পুরস্কার—দুলালচন্দ্র ঘোষ : আশুতোষ মহাবিদ্যালয়)
দ্বিতীয় পুরস্কার—সোমেন ঘোষ : ঐ
তৃতীয় পুরস্কার—ভবেশচন্দ্র বসু : ঐ
বিচারক : অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

কবিতা—

প্রথম পুরস্কার—সুশীলকুমার বশিষ্ঠ : আশুতোষ মহাবিদ্যালয়।
দ্বিতীয় পুরস্কার—জয়দেব দাস : ঐ
তৃতীয় পুরস্কার—যোগব্রত চক্রবর্তী : ঐ
বিচারক : অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সলিল গঙ্গোপাধ্যায়।

আবৃত্তি—

প্রথম পুরস্কার—জয়ন্ত ঘোষ : আশুতোষ মহাবিদ্যালয়।

দ্বিতীয় পুরস্কার—শঙ্কর দাসগুপ্ত : ঐ

তৃতীয় পুরস্কার—যোগব্রত চক্রবর্তী : ঐ

বিচারক : অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রণয়বল্লভ সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অপূর্বরতন দত্ত।

এই উপলক্ষে গত ২২ জানুয়ারী পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে। সভায় পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রবীন্দ্র পাঠচক্রের অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত প্রণয়বল্লভ সেন মহাশয় প্রতিযোগিতার একটি বিষয়ের প্রথম পুরস্কার দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে এবং অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করা যায় না। রবীন্দ্র পাঠচক্রের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও আন্তরিক উৎসাহ দান করে আমাদের অনুষ্ঠানগুলোর সাফল্য-লাভে সহায়তা করেছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আর এর সঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিতোষ বসু ও শ্রীযুক্ত অপূর্বরতন দত্ত মহাশয়কে যাঁরা প্রতিটি কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আর স্মরণ করছি ছাত্রবন্ধু সর্বশ্রী সত্যব্রত সান্যাল, মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রলয় শূর, জয়সিংহ মুখোপাধ্যায়, হীরকশুভ্র পাণ্ডে, শংকর দাসগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র সেনগুপ্তকে।

কলেজ ছাড়ার দুঃখে আজ আমরা বিমর্ষিত, তেমনি সমভাবে আনন্দিত নতুনদের হাতে পাঠচক্রের কাজের ভার তুলে দিতে পেরে। নতুন আগন্তুকদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এইখানেই বিদায় নিচ্ছি।

সোমেন ঘোষ
যোগব্রত চক্রবর্তী
যুগ্ম সম্পাদক

বিতর্ক সমীক্ষা

বিতর্ক সম্পাদকের দায়িত্ব ভার হাতে নিয়েই অনুভব করেছি আমাদের কলেজের বিতর্কের মান পূর্বের তুলনায় বেশ কিছুটা নীচে নেমে গেছে। অবশ্য এর মূলে

প্রতিবেদন

কলেজে সুবক্তার অভাব নয়, বরং সুষ্ঠু কর্ম প্রচেষ্টার অভাব বলা যেতে পারে। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি রেখেই কাজ করার চেষ্টা করেছি।

এবার আমাদের বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন শ্রীবরুণ গাঙ্গুলী (৩য় বর্ষ বিজ্ঞান), তারাদাস ব্যানার্জী (২য় বর্ষ কলা), বিকাশ চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন নিখিল বঙ্গ আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ অংশ গ্রহণ করে।

ছাত্র সংসদের প্রযোজনায় আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও বিভিন্ন অসুবিধার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আগামী সম্পাদককে অনুরোধ করবো এদিকে যেন বছরের প্রথম থেকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এই এক বছরের বিভিন্ন কর্মধারার অভিজ্ঞতায় একটি বিতর্ক পরিষদের অভাব অনুভব করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র বিতর্ক পরিষদের মাধ্যমেই বিতর্কের মানোন্নয়ন সম্ভব। আশা রাখি এ-বিষয়ে আগামী ছাত্র-সংসদ দৃষ্টি দেবেন।

শোভেন বসু
বিতর্ক সম্পাদক

চীপ ক্যান্টিন

চীপ ক্যান্টিন সম্পাদক হিসাবে এক বছরে যা যা করতে চেয়েছি তা ছাত্র বন্ধুদের সামনে উপস্থিত করছি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও কলেজের চীপ ক্যান্টিনকে আশানুরূপ উন্নত করতে পারি নি।

কাজ করতে গিয়ে যে সব বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা ছাত্রবন্ধুদের জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথমতঃ আশুতোষ, যোগমায়া দেবী এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তিন বিভাগের ক্যান্টিন পরিচালনার দায়িত্ব এক পরিচালকের হাতে থাকা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ অল্প সময়ের মধ্যে খাবার তৈরী করে বিক্রী করা সুবিধাজনক নয়।

দ্বিতীয়তঃ কলেজের ক্যান্টিন চারতলায়। ছাত্রবন্ধুদের কাছে চারতলায় উঠে কলেজ ক্যান্টিনে আসার চেয়ে বাইরের যে কোন রেস্টুরেন্টে যাওয়া অনেক সুবিধাজনক। এবং যার ফলে কলেজ ক্যান্টিনে আর্থিক লাভের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

এইসব কারণে কলেজ ক্যান্টিনকে একতলায় নামিয়ে আনার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানিয়েছি।

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

কলেজের ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কলেজের ক্যান্টিনের উন্নতি সম্ভব নয়। ছাত্রবন্ধুদের কাছে আবেদন তারা যদি সক্রিয় ভাবে ছাত্র সংসদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

যে সব বাস্তব অসুবিধা এ বছরে চাঁপ ক্যান্টিনের উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আশা করি আগামী সংসদ সে দিকে দৃষ্টি দেবেন।

রাধাকান্ত সিংহরায়
সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ নূতন ছাত্রাবাস

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

গভীর বেদনাভারাক্রান্ত কিন্তু গর্বিত হৃদয় নিয়ে আমরা জানাচ্ছি যে, গত পাক্-ভারত সংঘর্ষে আমাদের ছাত্রাবাসেরই প্রাক্তন ছাত্র স্বর্গত অভিজিৎ চ্যাটার্জী দেশরক্ষা কার্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।—"হে তরুণ বীর! তোমার বীরোচিত কার্যের জন্য তোমাকে জানাই শতকোটী প্রণাম।"

'৬৫-র সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তে চলে গেল। রক্তিমাভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে পূর্বাকাশে দেখা দিল '৬৬-র জ্যোতিষ্মান ভাস্কর। '৬৫ পটভূমিকায় যে দিনগুলি স্পষ্টাক্ষরে লেখা রইলো তা আমাদের পক্ষে সত্যই গৌরবোজ্জল।

ঐতিহ্যময় ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা শ্রদ্ধার সহিত পালন ক'রেছি। জাতির কর্ণধার মহানায়ক নেতাজীর জন্মদিবসও আমরা যথারীতি পালন ক'রেছি। এরই মধ্যে অশ্রুপূর্ণচোখে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রতে হ'য়েছে এক অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে।

এবছর আমাদের খেলাধূলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সত্যই কৃতিত্বপূর্ণ। এবারে আমাদের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক, তবে আগামী বছরে আমরা আরও ভাল ফল আশা করি।

খেলাধূলার ব্যাপারেও আমাদের ছাত্রাবাস পিছিয়ে নেই। আমাদের খেলাধূলার প্রতিযোগিতা সাধারণতঃ দু'টি ছাত্রাবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফুটবল খেলায় যদিও আমরা বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারিনি, তবে ক্রিকেট খেলায় আমাদের ছাত্রাবাস সুদৃঢ় কৃতিত্বের পরিচয় দেখিয়েছে। আমাদের ছাত্রাবাস পুরাণো ছাত্রাবাসকে হারিয়ে দেয়। আমাদের এই কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের মূলে ছিল শ্রীঅশোক ধরের

সুষ্ঠু পরিচালন-দক্ষতা, শ্রীমান দীপক ব্যানার্জীর সুদৃঢ় ব্যাটিং এবং শ্রীমান তারক মুখার্জীর মারাত্মক বোলিং। তা ছাড়া আমাদের দুইটি ছাত্রাবাসের সশ্রদ্ধ দুই অধীক্ষক মহাশয়গণের একজনের বোলিং এবং ব্যাটিং, অপরজনের সময়ানুপাতিক দৃঢ় ব্যাটিং এবং তাঁহাদের সহৃদয় সহানুভূতি সত্যই উল্লেখযোগ্য। পুরাতন ছাত্রাবাসের অধীক্ষক মহাশয়কে এবার আমরা ব্যাটহাতে মাঠে পেয়েছি। সুখ-স্মৃতির ভাণ্ডারে আরও কিছু সঞ্চয় আমরা এখান থেকে বাড়িয়েছি। আগামী বছরেও আরও নিপুণ খেলোয়াড় তৈরী হবে বলে আমরা আশা রাখি।

এরপর আসি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে। এবার আমাদের সরস্বতী পূজা সুন্দর রুচিশীল পরিবেশের মধ্যেই সম্পন্ন হ'য়েছে। পূজামণ্ডপ এবার বেশ সুদৃশ্যসজ্জিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে একমাত্র কৃতিত্বের অধিকারী শ্রীঅশোক ধর। তাছাড়া অতিথি-অভ্যর্থনা, প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন প্রভৃতি ব্যাপারেও আমাদের কোন বছরের তুলনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি।

আমাদের ছাত্রাবাসের টেক্সট্ বুক লাইব্রেরীর কথা না লিখলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অপূর্ণ থেকে যায়। টেক্সট বুক লাইব্রেরী উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে আমাদের কাছে পরম সম্পদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর কলেবরও নোতুন নোতুন গ্রন্থে পরিপুষ্ট হয়েছে। নোতুন নোতুন পত্র পত্রিকায় আমাদের লাইব্রেরীটীও সুসজ্জিত।

সবশেষে আমাদের অধীক্ষক মহাশয়ের নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দিলীপকুমার রায়
সাধারণ সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ পুরাতন ছাত্রাবাস

কালবৃক্ষ হতে খসে পড়লো একটি পাতা, একটি বছর। তাই ১৯৬৫'র সূর্য নতুন, সজীব হয়ে ফিরে এল '৬৬'র সকালে। ছাত্রাবাসের আটচল্লিশটি তরুণের সবুজ হৃদয়ের ঢেউ শত তরঙ্গায়িত হয়ে আছড়ে পড়েছে কালের বেলাভূমিতে। আর তারই ফেনা দিয়ে লিখতে বসেছি, ছাত্রাবাসের কয়েকটুকরো হৃদয়ের একটি বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-উচ্ছ্বাস ও সাফল্যের ইতিহাস।

দেনা পাওনার হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে যেটা সকলের আগে মনে পড়ছে তা হচ্ছে প্রত্যেকটি কাজে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক মহাশয়ের বিপুল উৎসাহ, প্রেরণা যা আমাদের চলার পথে এনেছে দুর্বার গতি। তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়ে আমরা ঋণী।

প্রতি বছরের মত এবারেও আমাদের ছাত্রাবাসের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল

আশানুরূপ। মহান জাতীয় নেতাদের জন্মদিবস ও জাতীয় মুক্তিদিবস আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি।

আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তিরোধানেও আমরা কম দুঃখ পাইনি। তাঁর মহান আত্মার শান্তির জন্য আয়োজিত এক শোকসভায় আমরা শপথ গ্রহণ করেছি আমাদের জাতীয় জীবনের আসন্ন দুর্দিনের জন্য তৈরী থাকবার।

খেলাধূলার ঐতিহ্যও আমরা বজায় রেখেছি। নতুন ছাত্রাবাসের সঙ্গে ফুটবল খেলায় আমরা জয়লাভ করেছি। ক্রিকেটে আমরা জয়ী হতে পারিনি। তবে খেলার আসল অর্থ যদি হৃদয়ের ভাবধারার প্রকাশ ও দুই দলের বোঝাপড়া হয় তবে নিঃসন্দেহে এ ঐতিহ্য আমরা বহন করেছি। এরজন্য ক্রীড়া সচিব শ্রীনির্মল ধরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ছোট করতে চাই না। আমাদের ছাত্রাবাসের দু'জন ছাত্র শ্রীনির্মল ধর ও শ্রীশ্যামসুন্দর মান্না কলেজ ফুটবল দলে খেলবার সুযোগ পেয়েছেন। শ্রীনির্মল ধর কলিকাতার বিশেষ বিশেষ এ্যাথলেটিক্স্ স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাব ও ছাত্রাবাসের প্রতিনিধিত্ব আমাদের গর্বের বস্তু।

বাগ্‌দেবীর অর্চনাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে আমাদের ছাত্রাবাসে। যথাসম্ভব ব্যয় বাহুল্য ত্যাগ করে আমাদের পূজো শেষ করতে হয়েছে। এরজন্য ছাত্রাবাসের প্রত্যেকটি ছাত্র যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁরা হচ্ছেন শ্রীভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীসৌরেন জানা ও শ্রীরমাপতি দ্বিবেদী। শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক মহাশয়ের প্রেরণায় একটি সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরজন্য সাংস্কৃতিক-সচিব শ্রীপ্রাবৃট্‌দাস মহাপাত্রকে ধন্যবাদ জানাই। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীপরেশচন্দ্র সেন আমাদেরই কলেজের অধ্যাপক। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এবার বিদায়ের পালা। আসছে নতুন দিন, নতুন কলম, নতুন পাতা। আসছে নতুন ছাত্রদল। আশা রাখি, এইসব তরুণ ছাত্রদের মধ্য থেকেই বের হোক্ আগামী দিনের নেতাজী, মানবেন্দ্র রায়, বের হোক নতুন জীবনের শ্যামাঙ্কুর।

ভগীরথ মিশ্র
সহ-সাধারণ সম্পাদক

সাংস্কৃতিক বিভাগ

যেসব বন্ধুরা আমাকে কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করতে বলেছিলেন সর্বাগ্রে তাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, দীর্ঘ

প্রতিবেদন

একবছর এই আসনে অধিষ্ঠিত থেকে নানা বিষয় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সংক্ষেপে তারই বর্ণনা করছি।

পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণে যখন সমগ্র দেশ বিস্মিত, যখন কলকাতা নিষ্প্রদীপ, এই রকম পরিস্থিতিতে ১২ সেপ্টেম্বর আমরা অনাড়ম্বরভাবে নবাগত ছাত্রদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। সে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে কলেজের ছাত্র বন্ধুরাই। কোন রকম পেশাদার সংগীত শিল্পী অংশগ্রহণ না করার ফলে অনেক ছাত্রই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমাদের নোতুন প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা সম্ভব একমাত্র কলেজের ছাত্রদের অনুষ্ঠানে সুযোগ দিয়ে।

গত ২৩শে জানুয়ারী আমাদের কলেজে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব পালিত হ'ল। কলেজের ছাত্র দিয়ে গঠিত এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

মানুষের ইচ্ছে থাকা অন্যায় নয়, আমারও ছিলো। প্রত্যেক ক্লাশে ছোট ছোট কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে, নাটক, গান, বাজনা, আবৃত্তি, বিতর্ক, খেলাধূলা প্রভৃতি পরিচালনা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা আর কার্যকরী করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রতিবারের মত এবারেও বিতর্কানুষ্ঠান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়েছে।

মন আজ ভারাক্রান্ত। দীর্ঘ এক বছরে যে সব বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি এবং যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

শুভেন্দুমোহন ভট্টাচার্য
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

কমনরুম

প্রথমেই জানাচ্ছি আমার সেইসব ছাত্রবন্ধুদের অভিনন্দন, যেসব বন্ধু আমাকে দিয়েছিল "কমনরুম" পরিচালনার দুরূহ ভার। কমনরুম বিভাগ একাধারে কলেজের যাবতীয় Indoor Game পরিচালনা করে এবং বিভিন্নপ্রকার পত্রপত্রিকা পরিপুষ্ট একটি Reading Room সহ ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার পরিচালনা করে থাকে।

আমাদের কমনরুমের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যে এই বছর প্রথম আমরা কিছুসংখ্যক ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে একটি উপ-সমিতি গঠন করেছি।

ছাত্র বন্ধুদের উৎসাহিত এবং আনন্দিত রাখবার জন্যে আমরা টেবিল-টেনিস

খেলার সবরকম ব্যবস্থা পূর্বরূপই রেখেছি। টেনিস বলের অভাব থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা যাতে কোনরকম অসুবিধা বোধ না করে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ক্যারাম খেলোয়াড়দের কাছে নোতুন কেনা ম্যাচবোর্ডটা নিশ্চয় খুব আনন্দের খোরাক দিয়ে থাকবে।

আমরা কমনরুমে বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। তাতে বহু খেলোয়াড় ছাত্রবন্ধুরা যোগদান করে বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

পাটনায় অনুষ্ঠিত 'মইনুল হক' টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ কোরে বিশেষ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'টেবিল টেনিস' ও 'ক্যারাম' প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ অংশ গ্রহণ করে।

ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির এবং আনন্দদানের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ক ও বিভিন্নকালীন প্রকাশিত বেশ কিছুসংখ্যক উন্নত রুচিশীল পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকের সমাবেশ করতে পেরে নিজেদের গর্বিত বোধ করছি। এছাড়া কমনরুম বিতর্ক বিভাগের প্রচেষ্টায় সমকালীন বিভিন্ন সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের উপর একাধিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। কলেজ বহির্ভূত প্রখ্যাত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের ছাত্রগণ অংশ গ্রহণ করে।

প্রাতঃস্মরণীয় মনীষিগণের প্রতিকৃতির সাহায্যে ছাত্রবন্ধুগণের তরুণমনকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ কলেজ ছাত্র-সংসদের সহায়তায় বেশ কিছুসংখ্যক প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের প্রতিকৃতি কমনরুমে স্থাপন করা সম্ভব হয়।

নানা প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারা দিয়ে কমনরুম উপসমিতি ও ছাত্রবন্ধুগণের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পরামর্শ নিয়ে গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে কতদূর বৈচিত্র্য উৎপাদন করতে পেরেছি—তার বিচার ছাত্রবন্ধুরাই করবে। কমনরুমের কার্য-ভারকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন সম্মানীয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ মহাশয় এবং কমনরুমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায় ও ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। নোতুনদের জন্য থাকল আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

অচ্যুৎ সিংহ
সম্পাদক

গ্রন্থ-আলোচনা ঃ

পাখি জানে—শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। সাহিত্য ১৮, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য তিন টাকা।

তুলি আর লেখনী চিত্রশিল্পী ও কবির সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। সেই দুই ধারা যদি একই জনের মধ্যে মিলিতভাবে প্রকাশ পায়—তাতে যে সুষম শিল্পবোধ ও সুরুচির পরিচয় মেলে তা খুব সহজলভ্য নয়। এমন যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে।

আনন্দের কথা, শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের "পাখি জানে" কাব্যগ্রন্থ এই দুর্লভ গুণের অপূর্ব সমন্বয় নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যগ্রন্থ বলে কবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য পাবে সত্য, কিন্তু অন্যদিকগুলিও উল্লেখযোগ্য—একথা কঠোরতম সমালোচককেও স্বীকার করতে হবে।

অনুভূতির কৃত্রিমতাকে ঢাকবার জন্য যে-যুগে কবিরা দুর্বোধ্যতার অন্তরালে আত্মগোপন করতে তৎপর, সে-যুগে সহজবোধ্য ভাষায় ভাবপ্রকাশে সমর্থ হয়েছেন শ্রীমলয়শঙ্কর। এতে এটাই প্রমাণিত হয়, কবির অনুভূতি অকৃত্রিম। সেই নির্ভেজাল ভাবাবেগকে তিনি যথাযথভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও অর্থবহ করে তুলেছেন। 'হাওয়ার সূত্রে', 'আপেল বাগানে', 'জন্মদিনে', 'সেই নির্জন লোকটার গল্প' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতার নাটকীয় ভঙ্গীটি উপভোগ্য, স্বগতোক্তি-রীতিটি মনোরম।

আধুনিক মন ও যুগোপযোগী সচেতনতা থাকায় ভাবের দিক দিয়ে কবি আধুনিক; কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে অত্যাধুনিক উগ্রতা অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর একটি কবিমন আছে। তাকে তিনি পাঠকের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ছন্দকর্মেও কবির নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। উপমাপ্রয়োগে বা চিত্ররচনায় কবির দক্ষতা লক্ষণীয়। যেমন—

"বিকেলের রঙ
সজনে গাছকে সোনা করে উঠোনে জলছে;
সূর্যের শরীর স্বপ্নময়।"

অথবা—

"ইচ্ছে করছে জড়িয়ে ধরি হাওয়াকে; কিংবা হাওয়া আমাকে জড়াক্
আমলকি গাছটা দুলছে, তারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমাদের মতো শিহরন।"

—ইত্যাদি।

একদিকে প্রকৃতির রঙিন চিত্র, স্বপ্নময় কবিকথা যেমন শোনা যায়, তেমনি 'ফুল ছিঁড়লে', 'ট্রেনের মতিগতি', বা 'প্রতিদিন লোকটা' ধরণের কবিতাও কবির রচনারীতির বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে।

সাময়িক পত্রিকার পাতায় কবির নামটি পরিচিত হলেও কাব্যগ্রন্থ রচনায় "পাখি জানে" কবির প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু তা আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ়। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অতুলনীয়, বাঁধাই, কাগজ ও ছাপা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে গ্রন্থ-পরিকল্পনা প্রকাশকের শিল্পবোধ, সাহিত্যপ্রীতি ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। সর্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে যে কাব্যটি প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য কবিকে আমরা বাঙলা শিল্প ও সাহিত্যের আসরে সাদরে আসন ছেড়ে দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবো।

অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

VOL/40

Asutosh College Magazine

Prof-in-charge/
Prof. Sukumar Banerjee

Editors/
Satyabrata Sanyal
Bhabesh Chandra Basu

1965

FESTIVAL CRICKET MATCH (1965-66)

Professors Vs. Students

Asutosh College Hindi Chhatra Parishad
1965-66

(*L to R*)—A. H. Khan, R. K. Sharma (Secretary), Bidhan Chatterjee (Ex-Gen. Sec.S. U.), Prof. R. N. Singh, Sri N. K. Bhattacharya, Vice-Principal, B. Ganguly (Gen. Secy. S. U), M. B. Singh, R. A. Misra, S. D. Singh.

ng 1st *Row* (*L to R*)—R. N. Chowdhury, T. Prasad, R. Yadav (Durwan) R. C. Singh (Durwan) Rajendra Prasad, S. P. Sinha, S. R. Sharma, B. D. Singh, R. Rai, B. N. Misra, B. N. Gupta, M. N. Roy, D. N. Prasad.

ng 2nd *Row* (*L to R*)—R. K. Prasad, T. K. Pande, R. C. Kothari, M. Hussain, B. D. Dubey, N. S. Singh, N. Singh, E. S. Wallia, R. K. Bardha, A. K. Mehata, A. Kumar, V. S. Upadhya (Treasurer).

Common Room Sub-Committee (1965-66)

Sitting on the Chair (*L to R*)—Achyut. K. Singha, Common room Secretary; Barun Ganguli, General Secretary S. U.; Vice-Principal Nirod Kumar Bhattacharya, Principal Khagendra Nath Sen, Prof Salil Ganguli, Prof-in-charge, Common room; Taradas Banerjee, Vice-President, S. U.;

Standing 1st Row (*L to R*)—S. Mantri; G. Ghosh; H. Sanyal; K. Mukherjee; T. Chatterjee; T. Banerjee; S. Bhattacharjee, A. Nag, A. Ghosh; R. Singh Roy.

Standing 2nd Row (*L to R*)—S. Sengupta; S. Bhattacharjee; A Mukherjee; D. Sen; T. Bose; M. Roy; A. Biswas; P. S. Dutta Roy.

A Retrospection

SRI KUNAL CHATTERJEE
1st year : Arts

Before the time of alchemists' days
We have strived to make the best
Of our power, to have the taste
Of supreme bliss and happiness.

O fearful time ! how oft I think of thee,
The most devastating power on earth,
An ogre raising his sceptre to end the mirth
And so vanquish life and its beauty.

A sad melancholy overswayed my mind
When of the glorious days I read,
A galaxy of eminent men the age produced
But alas ! the time is left behind.

Days were there when we were thought
To be the most prosperous and learned men,
Reverence and respect from all we did gain
Godliness through our perfection we sought.

But, O tempores ! O mores ! night has come to us.
It has shut with its blackish hue
Our treasures from the world's view,
One pities, one to tread on our land dares.

These contingencies we shall boldly face
And shatter the night's dark shroud.
Our land will once more be proud,
Our toils will give her an unrelenting grace.

In Memoriam

Prof. SRI SAILENDRA NATH SARKAR M. A.

A wave of grief swept the world following the radio announcement that Shastriji was no more. Death carried him away shortly after the signing of the historic covenant at Tashkent. We felt stunned and stupified to hear the dismal news. We could hardly believe it. Only the other day, so it seemed to us, he visited our city and addressed a mammoth meeting at the maidan. Even after the successful conclusion of the far-reaching Tashkent deliberations he did not betray any sign of exhaustion or ebbing vitality. This leads us to submit quietly to the unalterable dispensation of Providence. Man proposes, but it is God who disposes.

Shastriji's glorious dedication to the mission of peace raises him in the estimation of the world. With what unquestionable sincerity and single-minded devotion he applied himself to the task of promoting better understanding and relations between Pakistan and India. In his effort to restore security and tranquillity in this subcontinent. so rudely disturbed in recent months by a sudden and unexpected outburst of animosity between the two states, he rose to the height of sacrifice and embraced the death of a martyr far away from his hearth and home. It is painful to reflect that his life should be cut short at the moment of the realisation of his cherished dream of Indo-Pak amity.

Shastriji stepped into the position of the Prime Minister, shortly after the passing away of Sri Jawaharlal Nehru, an outstanding personality of inter-national reputation. Soon he succeeded in showing by means of his speeches and actions that he was a staunch and unflinching supporter of the policy of his predecessor, based on peaceful co-existence. It is really shocking that such a stout champion of peace and liberty had to take up arms against Pakistan. But it should be distinctly understood that it was no war waged with any aggressive intention or territorial lust. India accepted the challenge of her neighbour, much against her inclination, with a view to vindicating her honour, freedom and integrity. War was not

of his seeking nor its prolongation any part of his desire. This is quite evident from the eagerness and promptitude he showed in obeying the mandate from the U. N. O. for a cessation of hostilities. All the world witnessed how in the face of the gravest provocations from the other side Shastriji behaved with a calmness, dignity and self-possession which excite our admiration.

The offer of mediation from the Prime Minister of Soviet Russia came as a God-send to him. In it he saw the invisible hand of Providence working silently to bring about some sort of rapprochement between India and Pakistan. How heroically he stood the strain of the battle with the Pak President at Tashkent, though it was not a battle with guns, and tanks, and bombs, yet a battle after all, fought with the most powerful and most convincing of arguments in his armoury. His conduct, on this occasion, was marked by a snavity, tolerance and sweet reasonableness which were the most outstanding traits of his personality and made him the nation's idol in the brief space of eighteen months. It was a tragedy too deep for tears that he should leave us at a time when our country was preparing to give him a tumultuous ovation, on the happy ending of the deliberations at Tashkent. Truly the Tashkent Declaration remains an immortal achievement of Shastriji in the field of international politics, hearalding the dawn of a new era of Indo-Pakistan relationship.

Shastriji's services in the cause of the country and in the noble cause of peace have been recognised by no less a person than the President of the Indian Republic, Sri Sarvapalli Radhakrishnan albeit it has been necessarily a posthumous recognition. The title of 'Bharat-ratna' has been conferred on him. It is the highest distinction in the gift of the President. It means a jewel of 'Bharata'. And so Mother India has lost a jewel in the death of Sri Lal Bahadur Shastri.

We know so little of Shastriji's inner life. The scanty streaks of light that filter through the deep gloom encircling his private life reveal that he always lived a simple and unostentatious life. Fraud and fapsehood, deceit and dissimubation were alien to his nature. One finds it difficult to believe to-day that at the height of his power and prosperity as the Prime Minister of the world's biggest democracy he could not afford the luxury

of living in a house of his own or having a car of his own. Yet he had a small car and that was purchased only by incurring a loan. It was found after his death that he had left a debit account in his bank. Moreover, insurance or property he had none. What a life of idyllic beauty and charming simplicity Shastriji lived !

Shastriji had known the fiery ordeal of adversity in his early days. The hardships and privations he had experienced in his boyhood and youthful days had a chastening and refining influence on his character and made a man of him. As he could face a wretched situation with courage and resoluteness, so he knew how to meet the most marvellous revolution his fortune with perfect self-possession and without any undue elation of spirits. One or two instances will suffice to make it abundantly clear to all. Shastriji possessed, in a conspicuous measure, the virtues of flexibility and adaptability. He knew how to adapt himself to all sorts of circumstances. It was in the year 1963 that Shastriji voluntarily relinquished his office in the central cabinet and left for Allahabad with his belongings. On alighting from the plane at the aerodrome at Allahabad he waited for his luggage. He was assured repeatedly by his friends that his luggage would follow him. But this assurance gave him little comfort. Shastriji was fully conscious of his own humble position after his resignation from cabinet ministry. He spoke to his friends frankly that he was no longer a man of importance but he was an ordinary citizen of the state. So he could hardly expect that somebody would carry his load gratis for him. Besides not being born in affluent circumstances he had acquired the bitter experience of carrying his own burden. He actually left the aerodrome only after he had taken possession of his luggage.

On another occasion when Shastriji was Railway Minister he visited the city of Bombay. A gentleman came to see him and started ringing the bell. Mr. Shastri came out in ordinary clothes to receive him. But his homely dress, and his modest and unassuming look created no impression on the mind of the visitor. He could not recognise him as the Railway Minister. As he saw before him a small man in plain attire, he said, "Not you, but I want to see the Minister". At this Shastriji went in, concealing a smile. After a short while his private secretary

appeared with instructions to call in the visitor. What was the astonishment of the gentleman when he was ushered into the presence of Shastriji seated on the Minister's chair ! This proves conclusively that Shastriji was perfectly unpretending in his manners and deportment. Here is, indeed, one who bears an anlogy to our own 'Vidyasagar'.

Shastriji loved peace passionately and did all he could to keep the lamp of peace burning in Asia, for he saw with prophetic vision that in this thermo-nuclear age war would mean total annihilation of the human race. This explains why he was so keen on settling differences with Pakistan. The Taskent Declaration which is based on mutual renunciation of force is the outcome of his deep and intense longing for peace. It is a testament of far-reaching significance inasmuch as its value is not confind to India and Pakistan alone but is likely to extend to other free states.

The passing away of a man like Shastriji at a time when the world is theatened by another Armageddon is a calamity of unparalleled magnitude not only for India but for the rest of the world.

We all should honour the memory of this great man. Now we can best pay our homage, to his memory by honouring the Tashkent. Accord for which he laid down his life.

United Nations Progress since 1945

SRI SUBHASH CHANDRA SINHA
2nd Year : Arts

Peace has been hovering over the modern world for a safe-landing, but has not yet found out one. The people of the present century have witnessed the curse of two world wars. The devastations and distress, caused by the two world wars have created in human minds a deep-rooted abhorrence for war and made them think of devices for a permanent world

peace. Both the League of Nations and the United Nations Organisation were set up with the same end in view: The League of Nations was the child of the First World war and the United Nations is the offspring of the Second World War. From time immemorial, many great men of the world have been devoting their time, energy and thought in finding out the ways and means for reaching the goal of a permanent world peace. The League of Nations, which was set up with great hopes, failed to attain this object. So, the United Nations was set up in 1945 and the charater way drawn in such a way that the weakness of the covenant might be removed and its loopholes might be plugged.

The United Nations first objective, of course, is to "save succeeding generations from the scourge of war." Though local or "brush fire" conflicts have occurred, a major war has been averted. No prophet can say for sure what the world would be, if there had been no United Nations to cope with international crisis. It had to shuffle difficult cards in a large number disputes which might have led to international conflicts and disasters in the absence of tactful handling. Broadly these are the disputes between the Netherlands and the Indonesian Republic, interference in Greek affairs by British troops, the Berlin Blockade, Palestine situation, Anglo-Iranian oil dispute, corfu channel dispute, Korean dispute, Kashmir dispute, the Suez Canal dispute, the Hungarian dispute and the Congo dispute.

The United Nations has proved itself to be the only existing machinery that could help in bringing about peace in the world. It has not toppled down under the storm and stress of hectic activities of over a decade round the Berlin issue, Teheran issue, Greek solution, situation in Jerusalem, situation in Kashmir, Korea, Egypt, Hungary and, lastly, in Congo. It has arrested five wars—on the borders of Greece, in Kashmir, in Palestine, in Indonesia, and in Egypt. It has brought back peace in Korea and in Egypt. It has removed foreign troops from Syria, Lebanon, Burma, and Iran, and it helped to break the deadlock of the Berlin Blockade. The hopes of the world are centered in the U. N. for realisation of the ideals for which the United Nations has been established, attainment of peace and security and the promotion of all round development of the people. Under the able steering of late lamented Dag Hammerskjeold

and U. Thant, it has fulfilled the aims and objects outlined in the U. N. charter.

Ours is the thermo-nuclear age, which according to a modern philosopher, Bertrand Russell, is "a paradox of life and death." He says further : "Either this age will be the last chapter in the history of human existence on earth, or it will herald the dawn of a future cosmic era of inter-planetary civilisation." If occasionally our feet may falter along this dark and uncertain road to the future, with good will and good faith we shall not fail.

The United Nations is no longer a teenager, but a mature youth of 20 years. It has undoubtedly become the symbol and embodiment of the hopes and aspirations of the peoples of the world for peace, justice and progress. The lofty principles enshrined in the U. N. charter Constitute a testament of faith in the future of mankind. This faith can be maintained and strengthened only by the united efforts of all to rid the world of the ancient ills of hunger, ignorance and disease, and of the new terror of a nuclear holocaust. The world we seek, in the words of the late President Kennedy, is one in which "the strong are just, the weak secure, and the peace preserved."

The United Nations, like all human institutions, will change with changing conditions, but I am confident, it will grow stronger because in spite of its imperfections it has demonstrated its indispensability to the human race.

SHASTRIJI—Our great departed leader

SRI BHUPAL SUNDAS
2nd year : Science

The dull and gloomy morning of January 11, 1966 brought with it the shocking and tragic news of the death of our Prime Minister Sri Lal Bahadur Shastri. It was about 5-30 A.M. I was still in bed. All of a sudden I heard a man shouting 'Shastriji is dead.' At first I disbelieved it ; I thought how

could it be? But when I actually tuned on the radio, I was stunned to hear that our Prime Minister is no more.

On hearing this unexpected news, Calcutta became calm and quiet. Everywhere people gathered in small groups and murmurred among themselves. A sign of sorrow was seen on their faces, they were talking as if they had lost a great thing and indeed we had lost a very great thing—our beloved leader Shastriji.

After the death of Shri Jawaharlal Nehru, our country became an orphan, but Shastriji re-generated the nation by his firm determination perseverance and able leadership. Simple like a child, a man of short stature, soft and suave in speech and behaviour yet strong and firm in action Shri Lal Bahadur Shastri was born in October 2, 1904 in Moghal Sarai of Benaras District. He was brought up in a poor family by his maternal grand father, for he lost his father when he was only 18 months old. He had to walk about eight miles to school and again return everyday by walk. Sometimes he had to swim the Ganges with his books tied round his head because he had no money. In this way he was brought up and in 1921 he was imprisoned while taking part in the non-cooperation movement. During the freedom movement he spent many years in prison. He joined 'Kashi Vidyapith' after his release from prison and secured the degree of 'Shastri' and then joined Lala Lajpat Rai's 'Servants of People Society.'

After independence he served in the Union Cabinet as Railway Minister, Home Minister etc. He was once the General Secretary of the Congress Parliamentary Party lastly after the death of Shri Nehru, Shastriji was elected Prime Minister of India in June 1964.

Thus he was elected leader of the country at a critical junction when the nation was facing both internal problems (such as food, finance etc.) and external problems (such as aggression by neighbouring countries). He was Prime Minister only for 19 months, but these months were more than 19 years. In this short period he successfully solved language problems, food crisis and the problems arising out of the aggression by Pakistan.

He was brave and a great patriot. At the time of conflict with Pakistan, he bravely guided the nation, inspired the people

and gave the encouraging slogan '*Jai Jawan, Jai Kishan*'. Shastriji had love for the people, sympathy for the poor and worked for the unity and harmony of the country. He was an apostle of peace, a follower of Gnndhiji ahd Nehruji. Shastriji never wanted war, that was why he had gone to Tashkent to remove enimity and bitterness between India and Pakistan.

Unfortunately, when every one was anxiously waiting for Tashkent declaratian, the news of his sudden and unexpected death was a rude shock to all of us. His tragic death plunged not only India but the whole world in gloom and grief. Tributes were sent by the leaders from all corners of the world. Many leaders personally attended the funeral procession of Shastriji as a mark of respect to the memory of our great leader. He died in harness while serving the mother land, and passed away in such a time when our country was in need of a leader like him.

But though our leader is no more, his example, humanity, courage, patriotism and perseverance are with us and will remain for ever. Our duty is to devote ourselves to the unfinished task he left behind.

Glimpses of Thailand

Rev. U. NAMAWAMSA OF THAILAND

Thailand is one of the free countries in the world. She is the land of the magnanimous and smilingly talking people. Historically speaking, since she has formed and organized herself as a country, she has never been under a yoke of any country. With retrospection to the time immemorial, there was, however, a constant conflict amongst few dynasties prominent in her own territory. Such dynasties were not, of course, united. That was due to the fact that they had day in and day out, struggled for suprem power over one another. In the ancient time, the conflict with Burma and Cambodia could, anyway, be seen off and on. Even then her independence could be secured safe and sound. Even though during the Ayodaya period, Burma

had completely destroyed her dignity, she was not ruled. As such she had been left and remained independently.

Earlier, Thailand had been called 'Siam.' She has been named 'Thailand' only after the Second World War. The name 'Thiland' has been given by Americans—meaning 'free land.' This new name is quite well-known to foreigners. Thailand is, of course, a small country, but is of grandiose sceneries which are, however, very attractive. Throughout the country, there are only seventy provinces and the population is now running up round about thirty millions. Mostly fair means of communication from one province to the other is by no means recommended. She always keeps the door open for any outsiders who would perhaps wish to visit her. All of them staying whether longer or shorter are well regarded, As such a large number of them can inevitably be seen throughout the country. Especially Indians and Chinese are plenty. Simultaneously, all of them are living together very peacefully. They are, no doubt, free from external and internal hindrances and disturbances. Any restrictions as a whole are not found anywhere. In so far as the religion is concerned, even though Buddhism is the state religion, the other minorities like Hinduism, Muslim and Christianity can, by far, be seen, And such minorities can certainly function and follow their rituals freely from time to time.

As soon as the outsiders enter Thailand, the first sightseeing, they will see, is magnificent Pagodas and outstanding Temples. These Buddhist holy places, on the other hand, are mostly attractive as they have been put up by extraordinary skill of architects. Some of them have been established by the public and some by the private funds.

Historically speaking, since Thailand had adopted Buddhism as the state religion in the 13th century, the Buddhist followers had faithfully established various temples and Pagodas. Customarily, they were, of course, of opinion that to put up temples and Pagodas is great virtue. Particularly, the Kings, the then absolute head of the state, from day to day, keen on founding such holy places. Such practice, later on, became a tradition. During the Sukodhai period, a large number of them had been put up. In the Ayoday and Bangkok period as a whole, thousands of them were built not only by the Kings and

the public funds but also by the common people who were so faithful to Buddhism. At present totally, there are 25002 temples including pagodas throught the country. Most of them are beautiful and fascinating. So far as my knowledge is concerned, very few visitors avoid visiting them. Now the most atrractive and holy temple is Bos Pra Keo at which the image of the priceless or valueless Emerald Buddha can be viewed. This holy temple is open to the public twice a week. Apart from this, many other beautiful temples and pagodas can be seen. Bangkok city itself is more or less congested with temples, as the Kings and common people sustain a potentiality as well as a strong propensity in order to establish them. As such so many foreigners call Bangkok a city of Buddhist temples.

Nevertheless, the next thing the visitors will never fail to see, is Bhikkhus or priests. This institution of monk is the most popular figure in the field of culture in Thailand. Whenever you walk out of your residence, eveywhere, Buddhist monks will however be seen. This institution, on the other hand, is well respected, well-known and regarded as well. And as such it has been enhanced very, very well from generation to generation. It is always struck deeply in the people's heart. Year in and year out, a number of monks have been increased. Up to at ptesent there are approximately three hundred thousands of Buddhist monks throughout the country. They live in different temples subjectly to their personal desire.

Customarily speaking, in Thailand, most generally men who reach their twenty years of age are ordained as monks for some short period at least, before they get their marriage or profession. This is a custom rather than law. If they love to continue their monkhood for ever, they may, or if they desire to give up their robes they also can. There is no such restriction and force for them at all. As they were born free, they can also choose whatever they like. Nobody but they themselves are their own masters. Lord Buddha, the real great master of peace teaches us to act or decide all things according to our desire. Whether to give up robes retain them for ever is really subject to individual's personal desire. According to my knowledge, in Ceylon monks who happen to give up their robes are severely blamed criticized and regarded as backward persons

while such an atrocious and clumsy opinion cannot be found at all in Thailand. Instead, Thais regard ex-monks as the well-trained citizens of the country, and at the same time, they are praised and highly regarded. That is why a large number of officers, officials and other Government servants renounce the secular world to live in the spiritual world and to be trained for some times specially during three manths of rainy reasons. Even the present King had renounced his throne to take up monkhood for fifteen days. During such a short period, all these new monks have been trained with great intention daily, both in customs and manners.

So far as religion is concerned the majority of the Thais are Buddhists. Obviously, Buddhism had been brought to Thailand during the 3rd century before Christ in the time of King Asoka the Great, who was the most pious Buddhist. He had been the greates patron of Buddhism and aimed at spreading it not only at home but also abroad. With this objective in view, he had despatched a number of missionaries to different continents. Due to his energetic drive the major continents—Europe, Africa and Asia had entraced Buddhism. In Asia, Thailand is one of those countries which had been affected by this great religious propagation. Thailand—Suvanabhumi at that time, Buddhism was brought by Sona and Uttara. For centuries it was not proclaimed to be the state religion. This is due to the fact that the Thai people themselves were not united. There were various leading groups, and they were quite independent of one another. At the same time, they endeavoured to have supremacy over one another and such constant war amongst themselves had been taking place here and there, off and on. The unity was not however found. That being the case, Buddhism was half-dead and half-alive. It was like a man who was seriously ill.

Buddhism was, however quite fortunate and had stood firm and safe only when RAM KAMHEAWG the Great, the then King who had, by all ways and means, united all those leading groups and made Thailand a single whole of proclaimed it to be state religion. That is why Buddhism which was a tree without leaves, flowers and flowers and fruits becomes now like a tree rich in leaves, flowers and fruits. Now its long life is anyway assured. Almost all Thai people live heart and soul under its

mighty influence. We, the Thais love it, respect it and try to enhance it from time to time. It teaches us to be magnanimous, tolerant and to live happily with one another. It also teaches us that good action results in good and bad action results in bad. Following Buddhist philosophy and Buddhist dectrines every walk of life from the King, Royal family down to the common people, enjoys life and lives like brothers. Generally, the Thai people talk to others with smile. Whether they like or dislike they show smile always. Specially they care very such for foreigners who live in their country. All such foreigners are from time to time very warmly welcome so long as they live in their country. Supposing any foreigner doubts anything a Thai will hurridly rush to him to help and give information.

In connection with religious practice, specially Buddhism, we the Thai people owe much to India—the Bharata from which we have however been privileged to receive the Buddhist heritage. At the same time, we are very proud of India. So far all of us regard the Indians as our close friends. And such fascinating friendship may perhaps last long. As observed, now a days, a constant tour of the Thais to India can, however, be seen through out the year general, the main purpose of them is to worship all holy places of Buddhism. Even though at present it is quite possible to say that Buddhism is no longer seen in India the Thai people have never given up their strong ambition to tour India.

Simultaneously, all sorts of entertainment can be seen here and there throughout the country. Restaurants, bars, clubs, cinemas and all kinds of shops are open to the public day and night. All things can be bought easily and at any time. Particularly in Bangkok itself all transportations are operative throughout the day and night. The people can reach all the points, if they so desire. Plenty of taxis, and private cars await the passers by. No kinds of hindrances and difficulties are seen anywhere in Bangkok the capital city of Thailand. Specially Bangkok at night is not only pleochrous but also kaleidoscopic. Thousands of people choose different places for their recreation and relaxation. Some of them pass their time in a cinema, some in the Royal Park and some in a restaurant according to their personal desire.

Last of all, certainly, Thailand is always keeping the door

open to the people from abroad. Our Government has never, restricted the scope of entering the country. Instead it allows, and stimulates outsiders enthusiastically to pay a visit over there. And at the same time, all facilities have been provided for them very conveniently. So long as they are within its territory, their lives are safe-guarded. If the outsiders feel confused about their destination, the police come forward for assistance. They will politely guide, if they are asked for information. Apart from this simple information, the outsiders, may, if they wish, rush to the Tourist Organisation for a clear and definite information. As such they will not be disappointed at all. According to the statistics of the Organisation, lakhs of outsiders have visited Thailand. So far the Tourist Organisation is eager to serve all who visit the country. The more the foreigners visit our country, the more we are glad and happy. In short Thailand though a small country, is one of the most attractive countries in the world.

"Long live the world! Long live peace for the betterment of mankind."

The Romance Of Wireless

SRI AHI BHUSAN BOSE
2nd Year: Science

29th August, 1831 is the glorious day in electrophysical history. On that very day Michael Faraday, one of the greatest scientists, discovered that when a current is set in a closed circuit, the current is induced in another circuit placed near it. It two coils are made on two seperate iron cores and are placed side by side, current being set up through one, and a galvonometer is connected to the 2nd coil, the Galvanometer needle will deflect at the moment when current in the Ist. coil is set up or broken. He also noticed that when a bar magnet is introduced in or taken out of the coil which contains galvanometer in its circuit, the needle deflects in the same manner, but

the deflection is opposite, when the magnet is introduced, to that when it is taken out. From these experiments he proved that electricity and relative motion of a magnet and a coil is inter-related, and this phenomenon was called Induction. On the basis of the study of induction he also found out the most essential parts of our modern Radio, the condenser, which is made up of two metallic plates insulated from each other, the insulator in this case being termed as Di-electric medium.

The actual cause for which a current, flowing through a closed circuit was induced in another circuit placed near the first, was successfully described in between 1864 and 1871 by James Clark-Maxwell. He mathematicIly proved that when there is relative motion of a magnet and a coil or there is a change of flux in a coil placed near a similar coil, a wave, called electromagnetic wave, is created which was transmitted by Michael Faraday through ether medium. He also said that the light waves are another form of the electromagnetic waves. About the transmission of electromagnetic waves Maxwell said that it is transmitted just like water waves in a pond created by a stone thrown in the pond. The velocity of electromagnetic waves through ether medium is 186000 miles per second.

The mathematically proved theory of Maxwell was proved true by a German Professor, Heinrich Rudlof Hertz, in between 1857 and 1874 by his newly invented electric spark discharger for which Radio waves are termed as Hertzian waves. Hertx made a large induction coil with a spark gap arrangement and called it Oscillator, and another big metallic ring with a small spark gap, called Resonetor. When he passed electric current through Oscillator a spark is generated at the spak-gap, which is able to create a spark in the spark-gap of the Resonetor placed near the former. It was also observed that the spark is prominent only when the spark-gap is properly adjusted, thus proving that a particular gap is necessary for producing a particular spark i. e. for receiving electromagnetic waves of particular wave length. It is the Hertzian waves and hertzian experiments which are responsible for our modern Radio. But it is a matter of sorrow thae Hertzian experiments were only confined in laboratory. He was unable to find any sign and symbol to use it in wireless telegraphy.

It is Guglielmo Marcony, an Italian youth, who used it in

practical field. For the first time in the year 1894 he was able to send electromagnetic waves through the medium of ether to a distance of few miles. In the year 1896 Marcony. a youth of 22 years old, started his first experiment at his father's house at Bolona. He observed that when one of the two ends of the Resonetor is earthed and other is connected to an aerial, the resonetor was able to receive the spark, the distance between the resonator and the oscillator being greater than that in the previous experiment. Marcony gradually improved his experiment. Marcony gradually improved his experiment and made an induction coil of large size and made higher the aerials of his receiver and transmiter by using kites. Thus he was able to send electromagnetic waves at a distance of nine miles. In July 1897 he showed his experiment before Italian Governor and was able to establish a connection, not by wires but by electromagnetic waves, between two ships situated at places twelve miles apart from each other.

Now a question arises. Who is the real inventor of Radio ? Some say, it is Marcony. But it is a historical fact that Acharjya Jagadish Chandra Bose was able to transmit and receive radio waves (electromagnetic waves), before Marcony performed his experiments. The only cause for accepting Marcony as the inventor of radio is that he was the first man to be able to send radio waves at far distance. But he was mainly guided by the theories invented by Acharjya Jagadish Chandra Bose. In the year 1894 Acharjya Jaganish Chandra Bose did his experiment at the Presidency College, Calcutta and was able to explode a mine placed in a room by radio waves transmitted from another room.

After many years of experiments and by the hard toil of many scientists the Crystal detector was invented. It was made from naturally occurring crystal of galena as well as from artificially made crystal of Germenium. When one side of any of these crystals are connected by a conducting wire and other side is touched by a needle shaped conductor, the whole system behaves as a detector i.e. it allowes the current to pass in one direction only. Thus it transforms alternating current to direct current. Thus we get caystal receiver which was audible to one man only. Years passed by in search of better devices by which more than one man can listen the radio

programme simultaneously. An unknown person placed his crystal receiver in a big metallic chong and was able to make the programme audible by a few persons at a time,

By the hard work of Tomas Alva Edison, Dr. Lee De Forest etc. the modern radio valve came to be known to us and the first broadcasting station was established by Westing House Electric and Manufacturing Company of America in the year 1920, whose modern name is 'KDKA'.

Later, in June 1948, we get Transistor, which plays as a substitute for a valve in the modern radio and electronic equipments. Its size is much smaller than modern valves. Its energy input is much less than that of valves. An electronic Computer consists of more than one thousand valves for which its dimension is greater than that of a big room. But by using transistors for valves the space is reduced very much in size. In the villages, where there is no electricity, transistor sets and amplifiers play a very important role. The invention of modern transistor is based on higher mathematics hence, I am afraid, it will be difficult for a lay man to understand it.

For the interest of the reader, a simple Circuit Diagram of a three Transistor Receiving Set is appended herewith.

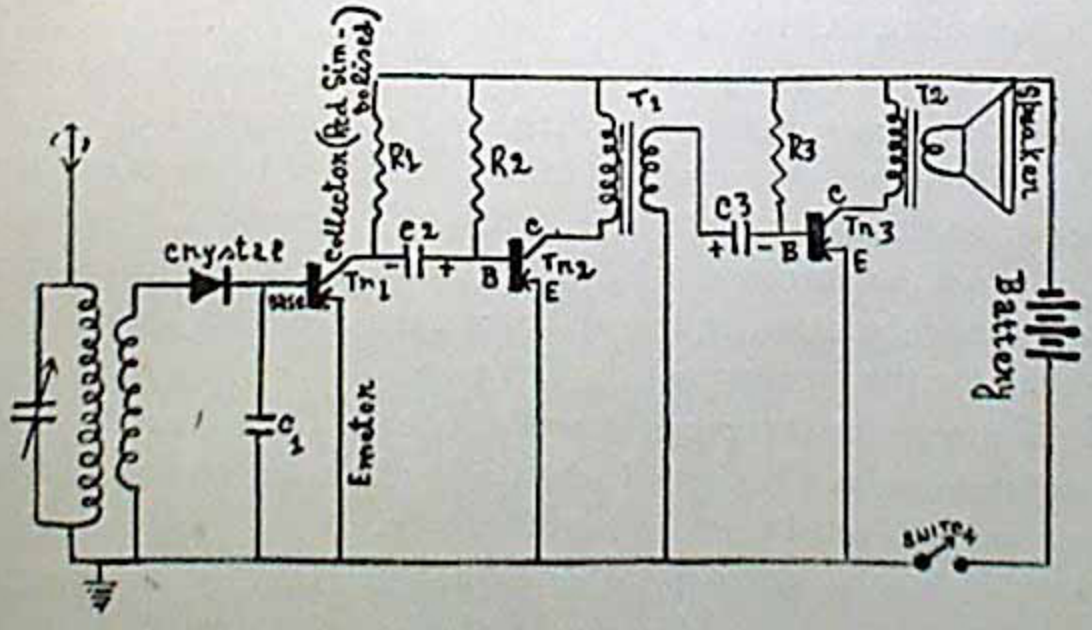

PARTS : C-500p.f. variablecondenser, C1-.001.mfd. cond., C2, C3-5mfd.electrolytic cond.; R1-4. 7killo ohms resistance, R2-220K ohms., R3-100K ohms ; Tri-2SB75 transistor, Tr2-2SB75 Trans., Tr3-2SB77 trans. ; Crystal-OA85 ; T1-input transformer of turn ratio 4.5:1, T2-Output transformer ; Speaker-6 ohms.

Annual Report, 1965

Ashutosh College Ambulance Division

JARNAIL SINGH, *Corporal*

The Ashutosh College Division was formed in 1933 and is now the second oldest Division in West Bengal. This division has been regularly continuing its First Aid and other relief work since its inceptiou. The normal duties include First Aid at Playgrounds, sports, functions, melas, social gatherings and also various other relief work including transport of patients from their residence to the hospital, etc., and vice versa. The service of the Division is not confined to Calcutta alone but is also extended throughout India when necessity demands.

The Division maintains a permanent First Aid post, a vaccination and inoculation centre in the College premises.

Principal Sri K. N. Sen and Vice-Principal Sri N. K. Bhattacharjee are the President and Vice-President respectively. Dr. P. K. Ghosh is the Divisional Surgeon and Sri A. R. Dutta is the superintendent. Sri P. K. Roy, Sri A. Banerjee are the two Ambulance Officers.

The Division is open to all bonafide students of Ashutosh College who have passed the First Aid examinations of the St. John Ambulance Association (India). First Aid classes are held once or twice a year for the students of Ashutosh College who want to be the members of the Division. First Aid theoretical and practical classes, squad and stretcher drills are held every Sunday for the members of the Division.

An important feature of the Ambulance Division is that the membership is not cancelled when a student leaves the College but continues until he loses his efficiency.

This year a fairly large number of casuality cases were attended while on public duty and about 150 casualties were attended while not on public duty. A fairly large number of the staff and the students of the Asutosh College and the Jogamaya Devi College were vaccinated agairst smallpox during the year under review. The Annual Inspection was held on 1. 8. 1965 at Syamaprasad Gymnasium 25 members were present

on the occasion. Mr. N. R. Sarkar, Staff Officer and Mr. S. Bose, Disttric Officer, were kind enough to inspect the Division. Principal K. N. Sen, M. A., and Vice- Principal N. K. Bhattacharjee, M. A., encoureged the members by their kind presence at the Annual inspection. The Annual Training Camp for the year 1965 was held at Durgapur from 25th December, 1965 to 31st December, 1965. A few members of our Division joined the Training camp. It is worth mention in this connection that our Ambulance Officer Sri A. Baneojee was selected to be the Adjutant of the Annual Training Camp at Durgapur. We feel proud of our young officer under whose efficient instruction and successful guidance the Training Camp was a great success. A large number of the members of our Division also participated in the ceremonial parade on the occassion of the Indian 'Republic Day'.

The Government of India has felt the need of First Aid Training in Military as well as in Civil life. Under their instruction, Civil Defence Casuality Service has been organised by the Director of Health Services, West Bengal. In this connection it is worth to mention that Sgt. Durgadas Saha, Cpt. Debabrata Marik, Cpt. Jarnail Singh and Cpt. Goutam Sengupta of our college have been appointed Honorary Instructors for training First Aid at different centres of the City. Cpt. K. P. Sen, Pte. S. B. Choudhury and Pte. Amit Mukherjee of our college are undergoing the instructorship training in the said casualty course.

In this connection, I avail myself of the opportunity of extending a cordial invitation on behalf of our Division to all the students of Asutosh College who wish to get themselves trained in First Aid under the auspices of our Division.

Asutosh College –N. C. C. (17 Bengal Bn)

LIEUTENANT K. K. MOOKERJEE

I feel a genuine sense of pleasure in announcing that our Battalion Second-in-Command Capt. K. S. Chatterjee has been promoted to rhe rank of Major and has been given the Officiating Command of this Battalion since May, 1965. This is indeed a proud achievement. Our heartiest congratulations to Major Chatterjee.

The year 1965-66 is marked by the 'Pakistani Aggression' on India. In view of the 'Pakistani Adventure' in the Rann of Kutch earlier in the year and the growing intimacy between China and Pakislan, the Government of India gave a green signal to the Nation for its preparedness to meet any challenge from other side of the frontiers.

The Directorate of the N. C. C. immediately took up a scheme to impart advanced type of Military training to some selected cadets, so that they might be absorbed in the regular sevices during the emergency. This was done in June, 1965, when the colleges were closed for Summer Vacation. I am proud to say that this Battalion imparted this advanced training under 'Be Prepared' scheme to more than one hundred cadets, the largest from any single Battalion in West Bengal. This is really encouraging when we remember that the cadets had their training without getting any travelling or washing allowance which is normally gjven to them by the the Government. The training programme coverd a period of 24 days of 120 periods and it includes—field craft (advanced level), Bayonet fighting, firing with C. Q. B. weapons, and the full course of civil defence. The training was purely voluntary. On the concluding day of the training course, there was an out-door-exercise inside the Fort William. The exercise was conducted by the Officiating Commanding Officer of the Battalion, Major K. S. Chatterjee and was witnessed by our President of the College Governing Body, Justice Ramaprasad Mookerjee, Principal K. N. Sen, Vice-Principal N. K. Bhattacharyya and the representatives of the Press in Calcutta. The show was highly commended by the Press and the V.I.Ps. After the completion

of training, there was 'Bayonet Fighting' competition amongst all the Units under group 'A' H. Q. of the N, C. C., West Bengal and Andamans. Here again, the team put up by this Unit, comprising U/o P. K. Majumdar, U/o S. Saha, Sgt. B. K. Dutta and Sgt. A. Sanyal came out first in the Bayonet competition and won the coveted trophy. The performances of these cadets are to be highly commended.

The President of this college Governing Body Justice Ramaprasad Mookerjee has a soft corner for the N. C. C. and it is due to his personal care and interest that the subject 'Military Studies' has been introduced as a regular course of study in the college in the Pre-University class this year inspite of the difficult financial position of the college. The achievements of the college N. C. C, Unit for the last 18 years is largely due to his patronage. I sincerely hope that under his guidance the college will get the affiliation in the Military Studies in the Degree Course (Pass). I will fail in my duty if I do not express our gratitude to our Principal Sri K. N. Sen. We have never found his failing to lend his support to the cause of the N. C. C. When the mockery of the compulsory N. C. C. training is going on, where a large number of students easily get out of its fold with the help of so many 'exemption clauses' and 'other methods', Principal Sen took the mast drastic step in not sending up some 63 students for Part 1 and P. U. Science Examinations in 1966, for their failure to attend thg desired number of N. C. C. parades during thc session. The decision of Principal Sen has earned great admiration in the official quarters. Vice Principal Bhattacharyya has been always there to render all possible help to the NCC. It is due to his effort that there is no serious problem in running the NCC training in the morning without hindering the class work in the college.

Unfortunately, the annual training camp for the year 1965-66 could not be held due to the emergency caused by the Pakistani Aggression. The training camp is now proposed to be held in September, 1966. I am glad to say that two of our cadets U/o S. Mookerjee and CSM N. Bhattacharyya were selected for the attachment with the regular unit at Wellington, Madras and they have been spoken of very highly by the appropriate authorty. I also congratulate U/o K. Choudhury for being

selected in All India advanced Leadership camp. U/o Choudhury showed keen sense of leadership in the camp. In keeping with our past record, three of our cadets, U/o P. K. Majumdar, U/o S. Saha, U/o J. Sen participated in the Republic day Parade at Delhi and were instrumental in winning the NCC Banner (Championship) for West Bengal for the third time in its career.

Lastly, this unit has made a record in the 'B' and 'C' Certificate Examination of the Army wing (Senior Division). 8 Cadets of this college, out of 9, have obtained the C. Cert and 30 cadets have received 'B' Cert.. Sri S. Khaitan has secured the only 'A' grade (80% above marks) in the 'B' Cert. Examination. I highly commend the performance of these cadets.

List of Editors

1946-1965

Editor-in-chief ; Pijuskanti Chatterjee, Arunkumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghosh, Suhas Kumar Roy, Ramprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar and Miss Srimati Chakravarty (1946)

Editor-in-chief ; Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee, Asoke Sengupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Pushpanjali Sen (1947)

Editor-in-chief : Tejen Guha Roy, Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan Roy, Prithwish Roychoudhury, Pranakrishna Bhattacharya and Bireshwar Banerjee (1948)

Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury (1949)
Madhusudan Ghosh (1950)

Arun Kumar Roy (1951) ; Smiritibikash Ghosh (1952)
Dulal Das (1953)
Gopal Chandra Banerjee (1954)
Samarendra Sengupta (1955)
Ashim Sengupta (1956)
Malayasankar Dasgupta (1957)
Ajay Gupta (1958)
Tripti Kumar Chatterjee (1959)
Gopal Bandyopadhyay (1960)
Sukanta Kumar Ray (1961)
Barun Kumar Banerjee (1962)
Jayanta Kumar Roy ; Amit Kumar Ganguli (1963)
Asim Thakur, Suprakash Saha (1964)
Satyabrata Sanyal, Bhabesh Ch. Basu (1965)

DECLARATION

Statement about ownership and other particulars of the Asutosh College Magazine :—

1.	Place of publication	..	Calcutta.
2.	Periodicity of publication	..	Yearly
3.	Printer's Name	..	Principal, Asutosh College.
	Nationality	..	Indian.
	Address	..	92 Shyamaprasad Mookerjee Road, Calcutta-26
4.	Publisher's Name	..	Principal, Asutosh College.
	Nationality	..	Indian.
	Address	..	92 Shyamaprasad Mookerjee, Road, Calcutta-26
5.	Editors' Names	..	(1) Satyabrata Sanyal (2) Bhabesh Ch. Basu
	Nationality	..	Indian.
	Address	..	Asutosh College, Calcutta-26
6.	Names and Addesses of the individuals who own the newspaper or publication	..	Asutosh College

I, Khagendra N. Sen hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ K. N. Sen
Publisher,
Asutosh College Magazine.

The magazine is printed and published in the official capacity of the Principal. The name of the present Principal is Khagendra Nath Sen.